২০০৩

পাক্ষিক আহ্‌মদী

নব পর্যায় ৬৬ বর্ষ ☐ ৩য় সংখ্যা

১৫ আগষ্ট, ২০০৩ ঈসাব্দ

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

আল্লাহ্‌তাআলার গুণবাচক নাম দ্বারা সুসজ্জিত ইউ.কে সালানা জলসা ২০০৩-এর সুদৃশ্য মঞ্চ

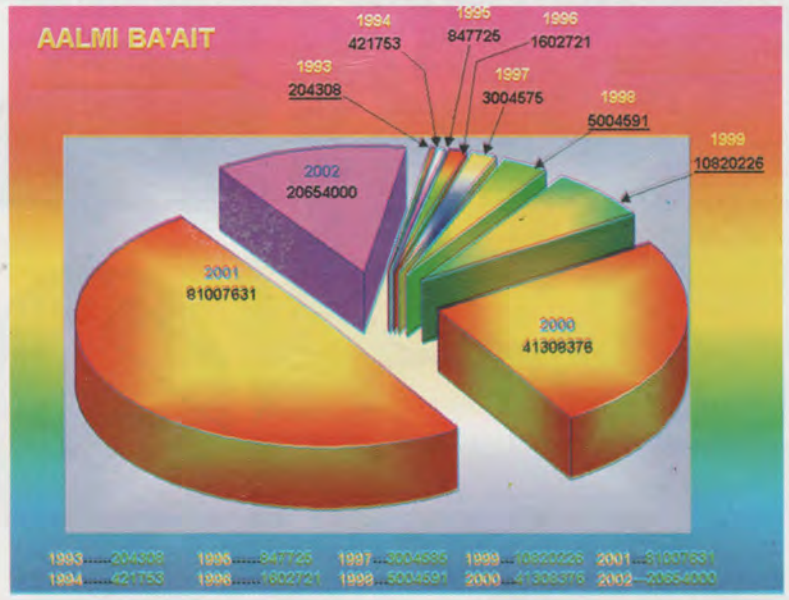

১৯৯৩ সন হ'তে ২০০২ সন পর্যন্ত আন্তর্জাতিক বয়াতের সচিত্র তালিকা

ইউ.কে সালানা জলসা ২০০৩-এ যোগদানকারী কয়েকজন বাঙ্গালী আহ্‌মদী

বয়াতের গুরুত্ব ও তাৎপর্য

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আইঃ) এবারকার যুক্তরাজ্য জামাতের সালানা জলসার শেষ দিনের সমাপ্তি ভাষণে সংক্ষিপ্তাকারে বয়াতের শর্তাবলী সম্বন্ধে গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য রেখেছেন এবং বিশ্ব জামাতকে এর গুরুত্ব ও তাৎপর্য উপলব্ধি করার আহ্বান জানিয়েছেন।

হযরত মসীহে মাওউদ আলায়হেস সালাম ঐশী নির্দেশে কুরআনের শিক্ষার আলোকে বয়াতের ১০টি শর্ত নির্ধারিত করেছেন। বয়াতের এ শর্তগুলোর ওপর আমলের মাধ্যমেই একজন বয়াতকারী সঠিকভাবে আল্লাহ্‌কে সাক্ষী রেখে কলেমা শাহাদত পাঠ করে যে বয়াত করেন তাতে প্রতিষ্ঠিত আছেন বলে প্রমাণ করতে পারেন। বয়াতকারী নিজ জীবনে বয়াতের শর্তাবলী পালন না করতে পারলে শুধু মৌখিক বয়াতের কোন মূল্য নেই। এ প্রসঙ্গে হযরত মসীহ্ মাওউদ আলায়হেস সালাম বলেন,

"জানা আবশ্যক, কেবল মৌখিক বয়াতের (দীক্ষা গ্রহণের) কোন মূল্য নেই, যে পর্যন্ত না মানব সর্বান্তঃকরণে তন্নিহিত শিক্ষাকে পূর্ণভাবে কার্যে পরিণত করে। অতএব, যে ব্যক্তি আমার শিক্ষানুসারে পূর্ণভাবে কার্য করে। সে আমার সেই গৃহে প্রবেশ লাভ করে যাহার সম্বন্ধে আল্লাহ্‌তাআলা অঙ্গীকার করেছেন যে, 'তোমার গৃহের চতুঃসীমার মধ্যে যাহারা বাস করে আমি তাহাদিগকে রক্ষা করিব" (কিশ্‌তিয়ে নূহ)।

'বয়াত' শব্দের অর্থ নিজেকে বিক্রি করা। সাধারণ কোন মানুষের কাছে কোন মুসলমান নিজেকে বিক্রী করতে পারে না। হযরত ইমাম মাহ্‌দী আলায়হেস্ সালাম যে কত বড় আধ্যাত্মিক মর্যাদার অধিকারী একথা মহানবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের নির্দেশ- যখন তোমরা তার সন্ধান পাবে তখন তার বয়াত করবে যদি বরফের পাহাড়ের ওপর হামাগুড়ি দিয়েও যেতে হয়। নিশ্চয় তিনি আল্লাহ্‌র খলীফা আল্ মাহ্‌দী (সুনানে ইবনে মাজাহ্, বাবু খুরুজিল মাহ্‌দী) থেকে সহজেই প্রতীয়মান হয়।

সুতরাং আমরা যারা ইমাম মাহ্‌দী আলায়হেস সালামকে মেনে আহমদীয়া মুসলিম জামাতের সদস্য হয়েছি তাদের বয়াতের তাৎপর্য ও গুরুত্ব অন্তর দিয়ে উপলব্ধি করা উচিত। আমরা নিজেদেরকে বিক্রী করে দিয়েছি মহান আল্লাহ্ কর্তৃক প্রত্যাদিষ্ট যুগ-ইমামের হাতে। এখন তিনি যা বলেছেন সেভাবে আমাদের জীবনকে গড়ে তুলতে হবে। বয়াতের ১০টি শর্ত খাঁটি ইসলামের সার কথা। এগুলোকে মনোযোগ দিয়ে পড়ে উপলব্ধি করতঃ দৈনন্দিন জীবনে তা বাস্তবায়ন করাই আমাদের জীবনের মূল লক্ষ্য হওয়া আবশ্যক।

একদল লোক বলে, আহমদী হলে মানুষ নাকি কাফির হয়। প্রকৃতপক্ষে আহমদী হওয়ার ১০টি শর্ত জীবনে রূপায়ন করতে পারলে মানুষ ওলী আল্লাহ্‌য় পরিণত হতে পারে। আল্লাহ্‌তাআলা আমাদের প্রত্যেককে বয়াতের গুরুত্ব ও তাৎপর্য উপলব্ধি করে ওলী আল্লাহ্ হওয়ার সৌভাগ্য দান করুন, আমীন।

মোবাশ্‌শের উর রহমান
ন্যাশনাল আমীর
আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশ

পাক্ষিক আহমদী

নব পর্যায় ৬৬ বর্ষ ॥ ৩য় সংখ্যা

৩১ শ্রাবণ ১৪১০ বঙ্গাব্দ ১৫ জমাদিউস সানী ১৪২৪ হিঃ কাঃ
১৫ যুহূর ১৩৮২ হিঃ শাঃ ১৫ আগষ্ট ২০০৩ ঈসাব্দ

বার্ষিক চাঁদা ঃ বাংলাদেশ টাঃ ১৫০ ♦ ভারত টাঃ ২০০ ♦ অন্যান্য দেশে £ 50/ $ 100

ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক
মাওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ

নির্বাহী সম্পাদক
মোহাম্মাদ মুতিউর রহমান

বার্তা সম্পাদক
মোহাম্মদ আবদুল জলীল

প্রচার সম্পাদক
মাহবুবুর রহমান

শিল্প নির্দেশক
মোহাম্মদ তাসাদ্দক হোসেন

সহকারী শিল্প নির্দেশক
সালাহউদ্দীন আহমদ

বিজ্ঞাপন প্রতিনিধি
আব্দুল আউয়াল ইমরান

হিসাব ব্যবস্থাপক
মোহাম্মাদ আব্দুস সাত্তার

বৈদেশিক বিষয়ক উপদেষ্টা
এ. কে. রেজাউল করীম

বিদেশ প্রতিনিধি

মোহাম্মদ আব্দুল হাদী	-	লন্ডন, ইউ কে
মোহাম্মদ খলিলুর রহমান	-	নিউ ইয়র্ক
মইন উদ্দীন সিরাজী	-	ক্যালিফর্নিয়া
আজিজ আহমদ চৌধুরী	-	জার্মানী
কাউসার আহমদ	-	হল্যান্ড
এন, এ, শামীম আহমদ	-	বেলজিয়াম
ইসমত উল্লাহ্	-	জাপান
ইঞ্জিনিয়ার শরীফ আহমদ	-	নিউজিল্যান্ড
ডাঃ মাহবুবুল ইসলাম	-	অষ্ট্রেলিয়া

তত্ত্বাবধানে ঃ সেক্রেটারী পাবলিকেশনস্

আহমদীয়া মুসলিম জামাত বাংলাদেশ-এর পক্ষে আহমদীয়া আর্ট প্রেস, ৪ বকশী বাজার রোড, ঢাকা-১২১১ থেকে মোহাম্মদ এফ, কে, মোল্লা কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
ফোন ঃ ৭৩০০৮০৮, ৭৩০০৮৪৯, ফ্যাক্স ঃ ৮৮০-২-৭৩০০৯২৫
E-mail : amgb@bol-online.com

সম্পাদকীয়

'ব্লাসফেমী'র সাথে ইসলামের সামান্যতমও সম্পর্ক নেই

'ব্লাসফেমী' শব্দটি গ্রীক। এর অর্থ ঈশ্বর নিন্দা বা অধার্মিকের মত কথা বলা। (Samsad English to Bengali Dictionary)। কিন্তু আধুনিক এবং সীমাবদ্ধ ধারণায় 'ব্লাসফেমী' বলতে ঈশ্বর বা ঐশী বিষয়াদির ব্যাপারে বিদ্রূপ ও হানিকর বা অবিশ্বাস্য ব্যবহার করা বুঝায়। এতদর্থে প্রায় খৃষ্টান দেশে এগুলোকে বেসামরিক অপরাধ বলে গণ্য করা হয়ে থাকে। এটা করা হয় ইহুদীদের (Levit. ঃ XXIX) মাঝে প্রচলিত তাদের ধ্যান-ধারণার অনুকরণে। ইংল্যান্ডে সাধারণ আইনে এর শাস্তি ছিলো জরিমানা, জেল এবং অন্যান্য দৈহিক শাস্তি। 9w 3.G.35 এর অধীনে এটাকে প্রথমত সংবিধিবদ্ধ অপরাধ নির্ধারণ করা হয় এবং এর আওতাকে এতটা প্রসার করা হয় যেন খৃষ্টবাদের কোন কোন মৌলিক মতবাদের অধিকারের বেলায় এটা প্রযুক্ত হয় এবং মারাত্মক শাস্তির আওতায় আনা হয়। একেশ্বরবাদীদেরকে 3.G.3.C 170 এ ধারার আওতায় রেহাই দেয়া হয়। কিন্তু অন্যান্য অপরাধের বেলায় এটা প্রায়ই অকার্যকর হয়েছে। (Encyclopedic Dictionary of Art. Literature and Science Vol. 1, Page 150)।

'ব্লাসফেমী'র উপরোক্ত আভিধানিক অর্থ থেকে এটা সুস্পষ্ট যে, এর সাথে ইসলামের সামান্যতমও সম্পর্ক নেই। ইহুদী ও খৃষ্টান ধ্যান-ধারণাপ্রসূত এ প্রাচীন বর্বর আইন কেবলমাত্র প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করার জন্যে উদ্ভাবিত। মানবিক মূল্যবোধের নিকট এর যথেষ্ট আবেদন না থাকায় এ প্রায় Obsolete বা অকার্যকর। আজকে ইসলামের দোহাই দিয়ে কেউ কেউ (যেমন দৈনিক ইনকিলাবের ১লা জুলাই, ২০০৩ তারিখে জনৈক শহীদুল ইসলাম কবীর) বাংলাদেশে এ আইন পাশ করার উদ্যোগ গ্রহণ করতে বলেছেন। তাদের সামনে আমরা আঁ হযরত (সঃ)-এর নিম্নোক্ত হাদীস দু'টো রাখলে তারা কী বলবেন?

(১) যে অন্য কোন জাতির অনুকরণ করে সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত।

(২) যে আমাদের (রীতিনীতি বাদ দিয়ে) অন্যদের অনুকরণ করে সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়। তোমরা ইহুদী ও খৃষ্টানদের অনুকরণ করো না। (তিরমিযী)।

ইসলামী সহনশীলতার ধর্ম। নবী করীম সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের জীবনে এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ রয়েছে। আল্লাহ্ সম্বন্ধে অনেক আজে-বাজে কথা বলা হয়েছে। স্বয়ং নবী করীম (সঃ)-কে অনেক হাসি-বিদ্রূপ এবং গালি-গালাজ করা হয়েছে, অভিশাপ দেয়া হয়েছে, প্রাণে মারার সিদ্ধান্তও করা হয়েছে। কিন্তু তিনি (সঃ) এ ব্যাপারে কোন নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া দেখান নি বা আল্লাহ্ও তাঁর বিধানে এর শাস্তিমূলক কোন নির্দেশনা দেন নি। "মানুষকে বাক-স্বাধীনতা এবং প্রকাশের স্বাধীনতা দানের ক্ষেত্রে ইসলাম অন্য সব ধর্মের চেয়ে এক ধারা এগিয়ে আছে। সন্দেহ নেই যে, ইসলাম নৈতিকভাবে এবং নীতি শাস্ত্রগতভাবে ঈশ্বর নিন্দার বিরুদ্ধে ধিক্কার জানায় বটে, কিন্তু ঈশ্বর নিন্দার জন্যে কোন জাগতিক শাস্তিদানকে সমর্থন করে না। গভীরভাবে মনযোগ সহকারে ব্যাপকভাবে বার বার কুরআন শরীফ পাঠ করেও আমি এর মাঝে এমন একটি আয়াতও পাই নি যাতে বলা হয়েছে যে, ঈশ্বর নিন্দা মানব প্রদত্ত শাস্তিযোগ্য অপরাধ।

যদিও পবিত্র কুরআন অতি কঠোর ভাষায় অশিষ্ট আচরণ ও অশালীন কথাবার্তার বিরুদ্ধে কথা বলেছে, অন্যদের অনুভূতিতে, কারণ থাক আর না থাক, আঘাত করার বিরুদ্ধে বলেছে, তথাপি ইসলাম না তো ইহজগতে ঈশ্বর নিন্দার শাস্তি দানকে সমর্থন করেছে; না সে ক্ষমতা কাউকে দান করেছে" (হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (রাহেঃ) প্রণীত বিশ্ব শান্তি ঃ সমকালীন সমস্যাবলীর সমাধান, পৃষ্ঠা ৪৫)।

(অবশিষ্টাংশ সূচীর নীচে দেখুন)

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
কুরআন মাজীদ ঃ সূরা আল্ আনফাল	ঃ 'কুরআন মাজীদ' থেকে	৩
হাদীস শরীফ ঃ এতীম	ঃ অনুবাদ - মাওলানা সালেহ আহমদ	৩
অমৃত বাণী ঃ চশমায়ে মসীহী	ঃ অনুবাদ - জনাব মোঃ আজিম উদ্দীন	৪
জুমুআর খুতবা ঃ হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর কাশ্‌ফসমূহ হযরত ইমাম মাহ্দী (আঃ)-এর কাশ্‌ফের তুলনায় অনেক বেশি উচ্চস্তরের উচ্চ মার্গের হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (রাহেঃ)	ঃ অনুবাদ - মাওলানা মুহাম্মদ ইমদাদুর রহমান সিদ্দিকী	৫-১০
মসীহ্ (আঃ) হিন্দুস্তান মেঁ মূল ঃ হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)	ঃ অনুবাদ - মাওলানা আহমদ সাদেক মাহ্মুদ	১১
মুলাকাত ঃ হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (রাহেঃ)	ঃ সংকলন ও অনুবাদ - আলহাজ্জ নূরুদ্দীন আমজাদ খান চৌধুরী	১২-১৪
সমগ্র বিশ্বের ওপর হযরত রহমাতুল্লিল আলামীনের আশীষ ও কল্যাণ মূল ঃ হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রাঃ)	ঃ অনুবাদ - মাওলানা মুহাম্মদ ইমদাদুর রহমান সিদ্দিকী	১৫
ঐশীবাণী, যুক্তিবাদিতা, জ্ঞান এবং সত্য মূল ঃ হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (রাহেঃ)	ঃ অনুবাদ - অধ্যাপক মোঃ আমীর হোসেন	১৬-১৮
যুক্তরাজ্য জামাতের ৩৭তম সালানা জলসার প্রতিবেদন	ঃ সংকলন - মাওলানা মুহাম্মদ ইমদাদুর রহমান সিদ্দিকী	১৯-২২
মোনাজাতে রসুল (সঃ) ঃ মূল ঃ হাফেয মুজাফফর আহমদ	ঃ অনুবাদ - জনাব মোহাম্মাদ মুতিউর রহমান	২৩
মুসলিম মানসে 'খিলাফত' তথা 'উলীল আমর'	ঃ জনাব শাহ্ মুস্তাফিজুর রহমান	২৪-২৫
খতমে নবুওয়ত	ঃ জনাব সরফরাজ এম, এ, সাত্তার রঙ্গু চৌধুরী	২৬-২৭
ছোটদের পাতা ঃ এসো কুরআন শিখি	ঃ পরিচালক- জনাব মোহাম্মাদ মুতিউর রহমান	২৮
সেই চল্লিশজন	ঃ জনাব মোঃ ফজলে-ই-ইলাহী	২৯-৩০
নতুনদের পাতা ঃ		
● আমার জীবন, আমার সংগ্রাম	ঃ মাওলানা বশীর আহমদ	৩১-৩৪
● কবিতা ঃ ইমাম মাহ্দী (আঃ)- এর আগমন	ঃ জনাব নাসের আহমদ আনসারী	৩৫
সংবাদ	ঃ	৩৫-৩৬

প্রচ্ছদ ঃ ইউ, কে, (যুক্তরাজ্য) সালানা জলসা ২০০৩ ঃ ভাষণ দিচ্ছেন আহমদীয়া মুসলিম জামাতের পঞ্চম খলীফা হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আইঃ)

(সম্পাদকীয়-এর বাকী অংশ)

কুরআনে ঈশ্বর নিন্দার ব্যাপারটি ৫টি সূরায় এসেছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ সূরা নিসা ঃ ১৪১, ১৫৭ সূরা আল্ আনআম ঃ ৬৯, ১০৯, সূরা আল্ কাহাফ ঃ ৬ এবং সূরা আল্ মুনাফিকূন ঃ ৯।

উপরোক্ত আয়াতগুলো পাঠ করলে এটাই প্রতিভাত হয় যে, ঈশ্বর নিন্দার জন্যে পার্থিব শাস্তির কোন বিধান নেই আর এ ব্যাপারে কোন মানবীয় দখলও নেই। এর শাস্তি আল্লাহ্ স্বয়ং পরকালে দিবেন। এতটুকু শুধু বলা হয়েছে (৬ঃ৬৯), যে বৈঠকে আল্লাহ্ সম্বন্ধে আর তাঁর নির্দেশাবলী সম্বন্ধে আজে-বাজে কথা বলা হয় সেখান থেকে উঠে যেতে বলা হয়েছে এবং তা-ও ততটুকু সময় পর্যন্ত যতক্ষণ না তারা অন্য কথায় লিপ্ত হয়। এতটুকু প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। অন্যদিকে অন্যদের দেব-দেবীকে গালি দিতে নিষেধ করা হয়েছে এজন্যে যে, তারা না জেনে সত্য খোদাকে গালি দিতে পারে। ইসলামের এত সুন্দর শিক্ষা থাকার পরে কেন যে মানুষ 'ব্লাসফেমী'র মত জংলী আইন প্রবর্তনের দাবী করে তা আমাদের বোধগম্য নয়।

"সবশেষে, আমি সব চাইতে স্পর্শকাতর বিষয়টির কথা বলতে চাই, স্পর্শকাতর এ অর্থে যে, আজকের দিনের মুসলমানরা ইসলামের পবিত্র প্রতিষ্ঠাতার (সঃ) বিরুদ্ধে নিন্দার (ব্লাসফেমী) ব্যাপারে যতটা স্পর্শকাতর, ততটা স্পর্শকাতর অন্য আর কারও বিরুদ্ধে নিন্দার ব্যাপারে নয়, এমনকি খোদার নিন্দার বিরুদ্ধেও নয়। তবু, এখানে এমন একটা ভয়ানক ঈশ্বরনিন্দার ঘটনার কথা বলা হয়, যার উল্লেখ কুরআন করীমে করা হয়েছে। আব্দুল্লাহ্ বিন উবাই বিন সলুল ইসলামের ইতিহাসে চিহ্নিত মুনাফিকদের নেতা।

একবার একটা যুদ্ধের অভিযান থেকে ফেরার সময়, আব্দুল্লাহ্ বিন উবাই অন্যান্যদের মাঝে ঘোষণা করেছিল, তারা মদীনায় প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গেই মদীনাবাসীদের মধ্যকার সর্বোত্তম ব্যক্তি সেখানকার সর্বনিকৃষ্ট ব্যক্তিকে মদীনা থেকে বের করে দেবে (কুরআনের ভাষায়)

"তারা বলে, যদি আমরা মদীনায় ফিরে যাই তাহলে, সর্বাপেক্ষা সম্মানিত ব্যক্তি অবশ্যই সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট ব্যক্তিকে সেখান থেকে বহিষ্কার করে দেবে, অথচ (প্রকৃত) সম্মান আল্লাহ্র জন্য এবং তাঁর রসূল এবং মু'মিনদের জন্য; কিন্তু মুনাফিকরা তা অবগত নয়" (আল্ মুনাফিকূন - ৬৩ঃ৫৯)।

অভিযাত্রীদের সবাই বুঝতে পেরেছিল, এ অবমাননাজনক কথা সে বলছে হযরত রসূলে পাক (সঃ)-এর বিরুদ্ধে। তারা ঘৃণায় এবং ক্রোধে এত বেশি উত্তেজিত হয়ে উঠেছিল যে, অনুমতি পেলে তারা তৎক্ষণাৎ আব্দুল্লাহ্ বিন উবাইকে তরবারি দিয়ে কেটে টুকরো টুকরো করে ফেলতো।

প্রামাণ্য বর্ণনায় আছে, এ ঘটনায় উত্তেজনা এমন চরমে পৌঁছেছিল যে, স্বয়ং আব্দুল্লাহ্ বিন উবাই-এর পুত্র রসূলে পাক (সঃ)-এর কাছে উপস্থিত হয়ে স্বহস্তে তার পিতাকে হত্যা করবার অনুমতি প্রার্থনা করলো। ....

কিন্তু, হযরত রসূলে পাক (সঃ) না তার সে প্রার্থনা মঞ্জুর করলেন, না তিনি তাঁর সাহাবীগণের কাউকে সেই মুনাফিক আব্দুল্লাহ্ বিন উবাইকে কোন প্রকারের কোন শাস্তিদানের অনুমতি দিলেন। (ইবনে হিশাম কর্তৃক বর্ণিতঃ ইবনে হাশিম ঃ আস্ সিরাতুন্ নববীয়া, তৃতীয় খন্ড, পৃঃ ১৫৫)। এমন কি চরম মুনাফিকের মৃত্যুর পর আঁ হযরত (সঃ) যে অতুলনীয় আচরণ দেখালেন তা-ও স্মর্তব্য। (বুখারী ২য় খন্ড কিতাবুল জানায়েয, পৃষ্ঠা ১২১, বাব আল্ কাফন, পৃষ্ঠা ৯৬-৯৭)

"এই ঘটনা তাদের বিরুদ্ধে একটি যথোচিত জবাব, যারা গলা ফাটিয়ে চীৎকার করে যে, ইসলামের পবিত্র প্রতিষ্ঠাতার (সঃ) নিন্দাকারীদের জন্য একমাত্র শাস্তি হচ্ছে মৃত্যুদন্ড" (হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (রাহেঃ) প্রণীত প্রাগুক্ত পুস্তক)।

সুতরাং আসুন ব্লাসফেমীর জংলী আইন নয় আমরা ইসলাম ও রসূলে করীম (সঃ)-এর সোনালী ঐতিহ্যময় সহনশীলতার মাধুর্যময় গুণে নিজেরাও গুণান্বিত হই এবং অন্যকেও গুণান্বিত করার অভিযানে নিবেদিত হই।

- নির্বাহী সম্পাদক

কুরআন মাজীদ

সূরা আল্ আনফাল - ৮

كَمَآ اَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْۢ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ وَاِنَّ فَرِيْقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ لَكٰرِهُوْنَ ۝

৬। এর (অর্থাৎ এসব পুরস্কারের) কারণ হলো[১০৯৩] মু'মিনদের একদলের অপসন্দ সত্ত্বেও[১০৯৪] তোমার প্রভু-প্রতিপালক সঙ্গত উদ্দেশ্য[১০৯৫] তোমাকে তোমার বাড়ী থেকে বের করে আনেন।

يُجَادِلُوْنَكَ فِى الْحَقِّ بَعْدَ مَا تَبَيَّنَ كَاَنَّمَا يُسَاقُوْنَ اِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنْظُرُوْنَ ۝

৭। তারা (অর্থাৎ কাফিররা) সত্য সুস্পষ্টভাবে প্রকাশিত হওয়ার পর সে সম্বন্ধে তোমার সঙ্গে[১০৯৬] এমনভাবে বিতর্ক করে যেন তাদেরকে মৃত্যুর দিকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে আর তারা চেয়ে চেয়ে দেখছে।

وَاِذْ يَعِدُكُمُ اللّٰهُ اِحْدَى الطَّآئِفَتَيْنِ اَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّوْنَ اَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُوْنُ لَكُمْ وَيُرِيْدُ اللّٰهُ اَنْ يُّحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمٰتِهٖ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكٰفِرِيْنَ ۝

৮। এবং (স্মরণ কর) যখন আল্লাহ্ তোমাদের সাথে দু'দলের[১০৯৭] একটি তোমাদেরকে দেয়ার ওয়াদা করেছিলেন আর তোমরা নিরস্ত্র দলটিকে[১০৯৮] পেতে চাচ্ছিলে কিন্তু আল্লাহ্ তাঁর বাণী দিয়ে সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করতে ও কাফিরদের মূলোচ্ছেদ করতে চাচ্ছিলেন।

১০৯৩। সাধারণতঃ 'মত বা সদৃশ' অর্থে ব্যবহৃত 'কামা' শব্দ কোন কোন সময় 'এ জন্য' 'যেমন' বা 'তদ্রূপ' বা 'যেহেতু' ভাব প্রকাশার্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে (মুহিত) যদি 'মত'-এ সাধারণ অর্থে একে নেয়া হয় তাহলে এ আয়াতের অর্থ হতে পারতো, আল্লাহ্তাআলা তাঁর বান্দা বা দাসগণকে বিজয় ও মালে গনিমত দান করেছিলেন এবং সম্মানজনক সঞ্চিত খাদ্য-সম্ভার প্রদান করেছিলেন, যেরূপে তিনি করেছিলেন তখন, যখন তোমাকে তিনি তোমার গৃহ থেকে বের করে নিয়ে এসেছিলেন ইত্যাদি।

১০৯৪। মুসলমানরা মদীনা থেকে বাইরের দিকে যখন এগিয়ে চললো তখন তারা জানতো না, মক্কার সুসজ্জিত ও সুনিপুণ সৈন্য বাহিনীর মোকাবেলা করতে হবে। সেজন্য তারা যুদ্ধের পূর্ণ প্রস্তুতি নিয়ে আসে নি। অতএব পথে তারা যখন জানতে পারল, মক্কা বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়তে হবে তখন তারা উৎকণ্ঠিত হয়ে নবী করীম (সঃ)-কে জিজ্ঞেস করলে ঘটনার প্রকৃত অবস্থা তিনি পূর্বে কেন বলেন নি যাতে তারা শত্রুর মোকাবিলা করার জন্য পূর্ণ প্রস্তুতি গ্রহণ করে আসতে পারত। এ দুশ্চিন্তা তাদের নিজেদের জন্য ছিল না, বরং আঁ হযরত (সঃ)-এর নিরাপত্তার জন্য ছিল। তাদের অপ্রস্তুতির কারণে নবী করীম (সঃ) প্রকাশ্য বিপদের মুখে পড়ুন এটা তাদের নিকট অসহনীয় ছিল। এ আয়াতে 'তোমার বাড়ী থেকে বের করে আনেন'(তোমাকে) স্পষ্ট ইঙ্গিত করছে যে, আল্লাহ্তাআলা, যার ইচ্ছানুযায়ী আঁ হযরত (সঃ) মু'মিনগণকে মক্কাবাহিনীর সাথে সাক্ষাত-যুদ্ধে লিপ্ত হওয়ার সংবাদ পূর্বাহ্নে দেন নি, তাকে কখনও অরক্ষিত রাখবেন না। মুসলমানরা যুদ্ধের জন্য ভীত ছিলেন না। তারা অনিচ্ছুক ছিলেন, কারণ মানুষের রক্ত ঝরাতে তাঁরা পসন্দ করেন নি, এবং বিশেষ কারণও ছিল যে, রসূল করীম (সঃ) ব্যক্তিগতভাবে বিপদের মুখে এসে গিয়েছিলেন।

১০৯৫। 'বিলহাক্কে' অর্থ সৎ বা সাধু উদ্দেশ্য। এ আয়াত বদরের যুদ্ধ সম্পর্কিত।

১০৯৬। কোন কোন তফসীরকারকের ভ্রান্ত ধারণা এই যে, এ আয়াতে মুসলমানদের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু তা ঠিক নয়। এ আয়াত অস্বীকারকারীদের প্রতি ইঙ্গিত করছে। ইতিহাসে আদৌ এমন কোন প্রমাণ নেই, নবী করীম (সঃ)-এর সাহাবীগণ শত্রুদের সাথে যুদ্ধ করার ব্যাপার নিয়ে তাঁর সঙ্গে কোন প্রকার বাক-বিতন্ডার সৃষ্টি করেছিলেন। পক্ষান্তরে বর্ণিত আছে, বদরের যুদ্ধের পূর্বে আঁ হযরত (সঃ) যখন তাঁদের নিকট পরামর্শ চাইলেন তখন তারা সকলে সম্পূর্ণ প্রস্তুত বলে জানিয়েছেন এবং এমনকি তিনি যেখানেই নিয়ে যাবেন সেখানেই তারা তাঁর (সঃ) সাথে যেতে এবং যুদ্ধ করতে আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন (হিশাম)। এমনকি কাফিররাও মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে এসে স্বীকার করেছিল যে, যুদ্ধ-ক্ষেত্রে মুসলমানদেরকে মৃত্যুর অন্বেষণকারী বলে মনে হচ্ছিল (তাবারী)। এ আয়াতের তাৎপর্য এটাই, ইসলামের শত্রুরা সত্যকে তেমনি ঘৃণা করতো যেমন লোকে মৃত্যুকে ঘৃণা করে; অতএব মৃত্যু দিয়েই তাদেরকে শাস্তি দেয়া হয়েছিল।

১০৯৭। দু'টি দল অর্থাৎ (১) নিপুণ সুসজ্জিত সৈন্য বাহিনী যারা সম্পূর্ণ প্রস্তুত হয়ে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে এসেছিল এবং (২) মক্কার বাণিজ্য-সওদাগরী দল যারা উত্তরাঞ্চল থেকে মক্কাভিমুখে ফিরে যাচ্ছিল এবং তারা মোটামুটি অস্ত্র-সজ্জিত ছিল।

১০৯৮। মুসলমানরা স্বাভাবিক কারণেই মামুলি বা হালকা অস্ত্রধারী মরু-যাত্রী সওদাগরী দলের মোকাবিলা করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু সুসজ্জিত শক্তিশালী মক্কাবাহিনীর বিরুদ্ধে অপ্রত্যাশিতভাবে তাদের অবতীর্ণ হওয়াই আল্লাহ্তাআলার এরূপ করার উদ্দেশ্য ছিল তাঁর ওয়াদা অনুযায়ী সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করা এবং কাফিরদেরকে সমূলে উৎপাটিত করা। আরও দেখুন ৩ঃ১৪ এবং ৮ঃ৪২-৪৫ আয়াত।

হাদীস শরীফ

এতীম

কুরআন ঃ

وَوَجَدَكَ ضَآلًّا فَهَدٰى ۝ وَوَجَدَكَ عَآئِلًا فَاَغْنٰى ۝

"আর যে কোন প্রার্থীই হোক, তুমি তাকে গালি দিও না। এবং (তোমার ওপর) তোমার প্রতিপালকের যেসব নেয়ামত আছে তা তুমি প্রকাশ করতে থাক" (সূরা আয্ যোহা ঃ ১০-১১)।

হাদীস ঃ হযরত সাহল ইবনে সা'দ (রাঃ) বর্ণনা করেন। হুযূর সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আমি বেহেশ্তে এতীমদের এভাবে দেখা শুনা করব; এই বলে তিনি নিজের তর্জনী ও মধ্যমা অঙ্গুলী একত্র করে ইঙ্গিত করলেন। (বুখারী)।

ব্যাখ্যা ঃ ইসলাম পৃথিবীর সকল শ্রেণীর মানুষকে সম্মানের সাথে বাঁচার অধিকার নিশ্চিত করেছে। এ পরিপ্রেক্ষিতে কুরআনে দৃষ্টি দিলে কৃতদাসদের পর সবচে' বেশি এতীমদের প্রতিদৃষ্টি দেয়া হয়েছে এবং তাদের বিভিন্ন সমস্যার সমাধানও দেয়া হয়েছে। এ ছাড়াও এতীমদের সাথে সদ্ব্যবহার ও ন্যায়সঙ্গত আচরণ করার নির্দেশ দিয়েছে।

উপরোক্ত আয়াতে আল্লাহ্তাআলা হযরত রসূল করীম (সঃ)-এর মাধ্যমে সকলকে এ নির্দেশ দেয়া হচ্ছে, এতীমদের সাথে যেন কঠোর ব্যবহার করা না হয়। পিতা-মাতা আল্লাহ্র দেয়া নেয়ামতের মাঝে শ্রেষ্ঠতর যারা খোদা প্রাপ্তি ও জান্নাতপ্রাপ্তির সোপান হিসেবে কাজ করেন। পিতৃস্নেহ ও মায়ের মমতা মানুষকে দুঃখ গ্লানি হতে মুক্ত করে এক অনাবিল আনন্দ ধারায় নিয়ে যায়। কিন্তু যাদের পিতা নেই বা মা নেই বা পিতা-মাতা উভয়েই নেই অর্থাৎ যারা এতীম তাদের জীবনের কথা ভাবলেই কষ্ট লাগে। বিশেষ করে যারা শৈশবাবস্থায় এতীম হয় তাদের হৃদয়ের অভিব্যক্তি বর্ণনা করা খুবই কঠিন। তাই খোদার নির্দেশ, তাদের প্রতি কঠোর ব্যবহার করো না অর্থাৎ নম্র ব্যবহার করো।

আঁ হযরত (সঃ) স্বয়ং এতীম ছিলেন। তাঁর (সঃ) চাইতে অধিক এতীমের ব্যথা আর কে বুঝবে? এতীমদের ব্যাপারে তিনি তাঁর (সঃ) উম্মতকে অনেক নসীহত করেছেন এবং ইঙ্গিতে ও প্রকাশ্য

আমল দ্বারা তিনি তাঁর উম্মতকে শিক্ষা দিয়েছেন যে, এতীমদের প্রতি যত্নবান হও তাদের প্রতি সদয় হও, উপরোক্ত হাদীসে হুযূর (সঃ) বলছেন, তোমাদের সকলেরই কাম্য যেন কিয়ামত দিবসে তোমরা আমার সাহচর্য লাভ কর। আর এর এক পথ হলো তোমরা এতীমদের সাথে ভালো ব্যবহার কর। কেননা, কিয়ামত দিবসে এতীমগণ আমার সাথে থাকবে। অর্থাৎ যারা এ পৃথিবীতে এতীমদের প্রতি সদয় হবে না, তাদের সাথে যারা খারাপ ব্যবহার করবে কিয়ামত দিবসে তারা আমার নৈকট্য পাবে না। আর এতে এ-ও বলা হয়েছে, হে এতীমগণ! সুসংবাদ নাও কিয়ামত দিবসে তোমরা রহমাতুল্লিল আলামীনের সাথে থাকবে।

আমাদের সমাজে এতীমদের সাথে অনেকেই দুর্ব্যবহার করে। তাদেরকে সহায়-সম্পতি হতে বঞ্চিত করে। তাদের হক মেরে খায়। কুরআন ও হাদীস এমন ব্যক্তিদের শাস্তির সংবাদ দেয়। আমরা যারা হযরত ইমাম মাহ্দী (আঃ)-এর হাতে বয়াত করেছি, আমাদের কর্তব্য আমরা যেন এতীমদের সাথে সদ্ব্যবহার করি এবং তাদের অধিকারকে সুরক্ষা করি এবং যতটুকু সম্ভব এতীমদের প্রতি মায়া-মমতা স্নেহ প্রদর্শন করতঃ তাদের দুঃখ লাঘবের চেষ্টা করি। আল্লাহ্ আমাদের সকলকে এর তৌফীক দান করুন, আমীন।

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা - **মাওলানা সালেহ্ আহমদ**
মুরব্বী সিলসিলাহ্

অমৃতবাণী

হযরত ইমাম মাহ্দী (আঃ)

চশমায়ে মসীহী

(১৪তম কিস্তি)

যেমন তারকারাজি আকাশমন্ডলে ক্রমান্বয়ে উদিত হয়, তেমন খোদাতাআলার গুণরাজিও ক্রমান্বয়ে বিকশিত হয়। কোন যুগে মানব পরমেশ্বরের শক্তিমূলক গুণাবলী ও ব্যক্তিগত আত্মপূর্ণতার (অর্থাৎ রুদ্রগুণের) কিরণতলে নিপতিত হয়, আবার কখন কখন তাঁর সৌন্দর্যমূলক গুণাবলীর আলোক রাশি তার ওপর উদ্ভাসিত হয়। এরই প্রতি লক্ষ্য করে আল্লাহ্তাআলা কুরআন শরীফে বলেছেন, **কুল্লা ইয়াওমিন হুয়া ফী শান**। অতএব নরকে নিক্ষিপ্ত হবার পরক্ষণ হতেই অপরাধীগণের জন্যে পরমেশ্বরের উদারতা ও দয়াগুণ চিরতরে বিনষ্ট হবে, পুনরায় কোন যুগেই বিকশিত হবে না এমন ধারণা বিষম লজ্জাজনক ধারণা। ঐশ্বরিক গুণের বিনাশ ও বিলোপ নেই। পরমেশ্বরের মৌলিক গুণ ও প্রেম ও দয়া এটা তাঁর সকল গুণের প্রসূতি। মানব-দোষ সংস্কারকল্পে সময় সময় এ প্রেম, শক্তি ও ক্রোধব্যঞ্জক রুদ্র গুণাকারে উত্থলিত হয়, দোষ সংশোধনের পর আবার আপনরূপে বিকশিত হয়ে ঐশ্বরিক দানস্বরূপ চিরতরে তার সহায় হয়। খোদাতাআলা কোন খিট্খিটে মেযাজের মানুষের মত নন। তিনি কাউকেও অনর্থক শাস্তি দেন না। কাউকেও অত্যাচার যুলুম করেন না। মানুষ নিজ নিজ জীবনের ওপর যুলুম করে। তাঁর প্রেমেই মুক্তি, তাঁর বিচ্ছেদেই শাস্তি।(১)

এই তো জ্ঞান সম্বন্ধে আর্য্য সমাজের শিক্ষা। কোন ব্যক্তি পরমেশ্বর সমীপে কোন বিশেষ সম্মান লাভ করলে, অবতার ঋষি অথবা যার ওপর বেদগ্রন্থ অবতীর্ণ হয়েছিল এমন লোক হলেও তার সম্মানের স্থায়িত্বের যে কিছুমাত্র সম্ভাবনা নেই- এ শিক্ষা মতে তা স্বীকার করে নিতে হয়। কেননা, তিনি পরমেশ্বরের প্রিয়তম ও তাঁর নৈকট্য লাভের অধিকারী হলেও, সম্মানের সিংহাসন হতে বিচ্যুত হবেন, পুনর্জন্মের চক্রে পড়ে কীটপতঙ্গ প্রকৃত নিকৃষ্ট জীবে পরিণত হবেন, কখনও অনন্ত মুক্তি লাভে সক্ষম হবেন না। এদিকে মরণ যাতনা ওদিকে জনম যাতনা। এরূপে বার বার যাতনা দিয়ে পরমেশ্বর নিজ স্বত্ব আদায় করবেন। এদিকে আত্মা পরমাণুগণ অনাদি অনন্ত স্বয়ম্ভু সুতরাং পরমেশ্বরের অংশীদার, ওদিকে তিনি এত কৃপণ ও অনুদার যে, শক্তি থাকতেও এমন কি সর্বশক্তিমান হওয়া সত্ত্বেও কাউকেও অনন্ত মুক্তি দিবেন না।

আবার নিয়োগ প্রথা দ্বারাই বেদ বিধান মতে মানবজীবন কতদূর পবিত্র ও নির্মল হওয়া আবশ্যক তা বেশ বুঝা যায়। এ প্রথানুসারে আর্য্যসমাজ তাদের বিবাহিতা সহধর্মিণীগণকে পর-পুরুষের সাথে সন্তানোৎপাদনের নিমিত্ত সহবাস করাতে অনুমোদন প্রাপ্ত হয়েছেন এবং একাদশ সন্তান জন্মগ্রহণ না করা পর্যন্ত তাদের স্ত্রীগণ পর-পুরুষের সাথে প্রত্যহ সহবাস করতে পারবেন। আমি এ অসংলগ্ন কথা ত্যাগ করে মূল বিষয়ে প্রত্যাবর্তন করতঃ বলছি যে, আর্য্য-সমাজের মৌলিক বিশ্বাস মতে তাদের পরমেশ্বর অন্তর্যামীও নন সর্বজ্ঞও নন। তাদের সমীপে তাঁর সর্বজ্ঞতার কোনই প্রমাণ পাওয়া যায় না।

খ্রীষ্টানদের ধর্ম বিশ্বাসমতেও পরমেশ্বর সর্বজ্ঞ হন না। কেননা, যীশুখৃষ্টই তাদের ঈশ্বর কিন্তু তিনি নিজেই স্বীকার করেছেন, ঈশ্বর-পুত্র হওয়া সত্ত্বেও তাঁর পুনরুত্থান দিবসের সঠিক জ্ঞান নেই। অতএব স্বয়ং পরমেশ্বর পুনরুত্থান দিবসের (রোজ কিয়ামতের) সময় নির্ণয়ে অক্ষম, বাধ্য হয়ে এ সিদ্ধান্তে পৌছতে হয়।

পূর্ণ ও প্রকৃত মারফতের দ্বিতীয় শাখা খোদাতাআলার পূর্ণ শক্তির জ্ঞান। কিন্তু এস্থলেও আর্য্য সমাজ ও পাদরী সাহেবগণ আপন আপন পরমেশ্বরের প্রতি কালিমা আরোপ করেন।

আর্য্য সমাজের মতে পরমেশ্বর আত্মা ও পরমাণু সৃষ্টি করতে পারেন না,কোন আত্মাকে অনন্ত মুক্তি প্রদান করতে সক্ষম নন।(১)

পাদরী সাহেবগণ তাদের পরমেশ্বরকে সর্বশক্তিমান বলতে পারেন না। কারণ তিনি তার শত্রুদের হাতে মার খেয়েছেন, বেত্রাহত হয়েছেন, ক্রুশবিদ্ধ হয়েছেন। সর্বশক্তিমান হলে এমন লাঞ্ছনা ভুগতেন না। সর্বশক্তিমান হলে নিজদাসগণের মুক্তি সাধনের নিমিত্ত নিজ প্রাণ বিনাশের আবশ্যকতা হত না। যিনি খোদা হয়েও তিন দিন মৃত ও প্রাণহীন থাকলেন, তাঁকে সর্বশক্তিমান বলা লজ্জার বিষয়। স্বয়ং পরমেশ্বর তিন দিন যাবৎ নির্জীব ও শেষ যাত্রার পথিক ছিলেন, কিন্তু তাঁরই সৃষ্ট জীবজন্তুগণ তৎকালেও সতেজ ও সজীব ছিল, এটা আরো আশ্চর্যের বিষয়।

(১) মুক্তি-প্রাপ্ত নর-নারীগণ সকলেই বাস্তবিকই সমপদ বিশিষ্ট হবে এমন নয়, যারা দুনিয়াতে খোদাতাআলাকেই অবলম্বন করেছিল, খোদার প্রেমেই মোহিত হয়েছিল ও অটল সরল পথে সুদৃঢ় ছিল, তারা এমন বিশেষ উচ্চপদসমূহ লাভ করবে, যাতে অন্যেরা পৌছিতে সমর্থ হয় নি।

(১) বড়ই ধন্যবাদ ও আনন্দের বিষয় এই যে, আমাদের খোদাতাআলা, আমাদের ঈমান ও বিশ্বাস সতেজ ও অটুট রাখবার জন্য, সর্বদাই আপন ক্ষমতা ও শক্তির নিদর্শন প্রকাশ করে থকেন। বসন্তকালে পাঞ্জাবে এক ভীষণ ভূমিকম্প হবে, এ সংবাদ ১৯০৫ সনের ৪ঠা এপ্রিলের ভূমিকম্পের পূর্বে চার বার ভিন্ন ভিন্ন সময়, আপন ওহী ও আকাশবাণী যোগে, তিনি আমাকে জ্ঞাত করেছিলেন। তদনুসারে ১৯০৫ সনে ৪ঠা এপ্রিল মঙ্গলবার প্রাতে সেই ভীষণ ভূমিকম্প হয়ে গিয়েছে এবং তখন বসন্তকালই বিদ্যমান ছিল। সর্বশক্তিমান খোদা আমাকে সংবাদ দিয়েছিলেন যে, আবার বসন্তকালে ভীষণ ভূমিকম্প হবে। তদনুসারে ১৯০৬ সনে ২৮শে ফেব্রুয়ারী তারিখে ঠিক বসন্তকালে ভূমিকম্প হয়েছে। এর ধাক্কা মনসুরা পাহাড়ে এতই ভীষণ ছিল যে, মানুষ সংজ্ঞাহীন হয়েছিল। আবার এ বসন্তকালেই আমেরিকার কোন কোন অংশে ভীষণ ভূমিকম্প হয়েছে ও এতে কয়েকটি শহর ধ্বংস হয়েছে। অতএব প্রকৃত খোদা বা পরমেশ্বর তিনি, যিনি এখনও ওহী যোগে আমাদের প্রতি নিজ জীবন্ত শক্তি প্রকাশ করেছেন। এরূপ আরও সহস্র সহস্র ভবিষ্যদ্বাণী বিদ্যমান আছে যা তাঁর ওহী যোগে আমার নিকট প্রকাশিত হয়েছিল ও সময় মত পূর্ণ হয়েছে। (চলবে)

অনুবাদ - **মোঃ আজিমউদ্দীন**
চলিতকরণ ও সম্পাদনা - **মোহাম্মাদ মুতিউর রহমান**

হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর কাশ্‌ফসমূহ হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)-এর কাশ্‌ফ-এর তুলনায় অনেক বেশি উচ্চস্তরের, উচ্চ মার্গের

[সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা তাহের আহমদ, খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (রাহেঃ) কর্তৃক ১৭ জানুয়ারী, ২০০৩ইং তারিখে মসজিদ ফযল লন্ডনে প্রদত্ত]

তাশাহ্‌হুদ তা'আব্বুয ও সূরা ফাতিহার পর সূরা শূরার ৫২ আয়াত পাঠ করে হুযূর (রাহেঃ) খুতবা প্রদান করেন।

وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ اَنْ يُّكَلِّمَهُ اللّٰهُ اِلَّا وَحْيًا اَوْ مِنْ وَّرَآئِ حِجَابٍ اَوْ يُرْسِلَ رَسُوْلًا فَيُوْحِيَ بِاِذْنِهٖ مَا يَشَآءُ ؕ اِنَّهٗ عَلِيٌّ حَكِيْمٌ ۝

অনুবাদ ঃ এবং কোন মানুষের পক্ষে সম্ভব নয় যে, আল্লাহ্ তার সাথে বাক্যালাপ করবেন, কিন্তু ওহী যোগে অথবা পর্দার আড়াল থেকে অথবা এমন দূত পাঠিয়ে যে তাঁর আদেশানুযায়ী ওহী করে যা তিনি চান। নিশ্চয় তিনি অতি উচ্চ মর্যাদাবান, পরম প্রজ্ঞাময়" (সূরা শূরা ঃ ৫২)।

উল্লেখিত আয়াতের আলোকে কাশ্‌ফ সম্পর্কে আলোচনা হচ্ছে। গত খুতবায় হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর কাশ্‌ফসমূহ সম্পর্কে আলোকপাত করেছিলাম। আজ হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর কাশফ্-সমূহ সম্পর্কে আলোচনা করব। তবে পার্থক্য বড় সুস্পষ্ট করে বলে দিচ্ছি। **হযরত ইমাম মাহ্‌দী ও মসীহ্ মাওউদ (আঃ) হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর অনুগত গোলাম। গোলামের কাশ্‌ফ (দিব্য-দর্শন) সমূহের তুলনায় (ইমাম) হযরত রসূলে করীম (সঃ)-এর কাশ্‌ফ বহুগুণে উচ্চ পর্যায়ের এবং হুযূর (সঃ)-এর কাশ্‌ফসমূহের মাঝে অগণিত ভবিষ্যদ্বাণী বড় বড় ভবিষ্যদ্বাণীসমূহ ছিল।** রোম ও ইরান সম্রাটদের চাবীগুলোও আঁ হযরত (সঃ)-এর হাতে দিয়ে দেয়া হয়েছিল। অনুরূপভাবে আরো অনেক বড় বড় মহিমান্বিত কাশ্‌ফ ছিল যদ্বারা এ পার্থক্য স্পষ্ট যে, ইমামের মর্যাদা গোলামের চেয়ে অনেক উপরে। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর মর্যাদা গোলামের (দাসের) মর্যাদা-তবে হযরত মহানবী (সঃ)-এর গোলাম। পূর্ণ আনুগত্যের গোলামী।

কুশুফ (কাশ্‌ফসমূহ) সম্পর্কে বলতে চাচ্ছি, আঁ হযরত (সঃ) যে সমস্ত কাশ্‌ফ দেখেছেন সেখানে অনেক ক্ষেত্রে অন্যরাও শামেল

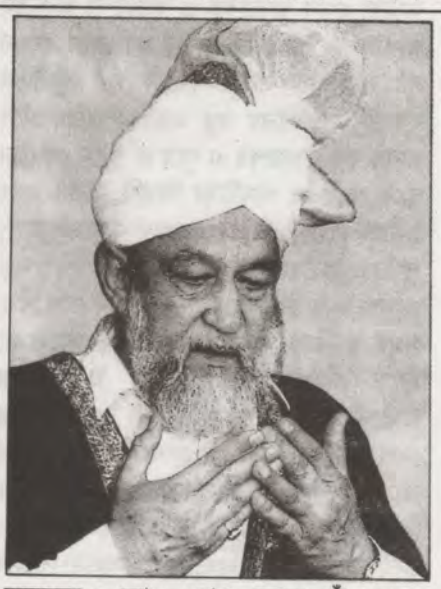

হয়েছেন। কোন কোন ক্ষেত্রে আঁ হযরত (সঃ) একা ছিলেন। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে আঁ হযরত (সঃ)-এর সাথে অন্যরাও কাশ্‌ফে সাক্ষী হয়ে গেছেন। হযরত জিব্রাঈল (আঃ)-কে আঁ হযরত (সঃ) যেমন দেখেছেন অন্যরাও অনেকে তখন দেখেছেন। তারাও সাক্ষী হয়ে গেছেন। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) কাশ্‌ফ দেখেছেন তো একাই দেখেছেন। আমার জানামতে অন্যরা শামেল হন নি। হযরত নবীয়ে করীম (সঃ) কাশ্‌ফের মাধ্যমে বড় বড় বিজয়ের দৃশ্য দেখেছেন এবং সেগুলো বাস্তবেও রূপ লাভ করেছে। অতি আশ্চর্যজনক উপায়ে সেসব ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণতা লাভ করেছে।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর কাশ্‌ফে অশ্বারোহী বাদশাহ্‌দের দেখানো হয়েছে যে, এরা তোমার আনুগত্য করবেন এবং বড় বড় কল্যাণ ও বরকত প্রদান করা হবে। আমিও কয়েকজন এমন বাদশাহ্ দেখেছি। এতে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই যে, তারা বাদশাহ্। এমন বাদশাহ্‌গণের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। আফ্রিকার অনেক বাদশাহ্ এমন কি বাদশাহ্‌দের বাদশাহ্‌ও ঈমান এনেছেন। তবে আঁ হযরত (সঃ) যে সব বাদশাহ্ দেখে ছিলেন তারা তো অনেক বড় বাদশাহ্ ছিলেন। কত বড় বড় ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন তারা। রোম সম্রাট, ইরান সম্রাট এর তুলনায় আফ্রিকার মত গরীব দেশের বাদশাহ্‌দের পার্থক্য সুস্পষ্ট।

এবার হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর কতিপয় কাশ্‌ফ আপনাদের সামনে তুলে ধরছি।

"এক ব্যক্তি নাম সাহাজরাম, অমৃতসরের ডেপুটি কমিশনারের সেরেস্তাদার। পূর্বে সিয়ালকোটেও সেরেস্তাদার ছিল এবং সেযুগে আমার সাথে তার ধর্মীয় বিষয়ে প্রায়ই তর্ক-বিতর্ক হোত। সে ব্যক্তি ইসলাম ধর্মের প্রতি বিদ্বেষভাবাপন্ন ছিল। ঘটনা এ রকম ঘটল যে, আমার বড় ভাই তহশীলদারীর পরীক্ষায় পাশ করেছিলেন। কাদিয়ানেই ছিলেন। কোন চাকুরী পাবেন এমন আশা করছিলেন। চেষ্টা করেছিলেন। একদিন আমি আমার ছাদের উপরের কোঠায় আসরের নামাযের পর বসে কুরআন শরীফ পাঠ রত ছিলাম। আমি যখন পৃষ্ঠা উল্টাতে গেলাম, তখনই আমার চোখ কাশ্‌ফের দৃশ্য প্রবেশ করল। আমি দেখলাম, সেই সাহাজরাম কাল পোষাক পরা সাহায্য-প্রার্থী হিসেবে আমার সামনে এসে দাঁড়ালো। তার দাঁত বেরিয়ে আছে, যেমন কেউ বলে, 'আমার প্রতি দয়া কর।' আমি তাকে জবাব দিলাম, 'এখন দয়া করার সময় নয়।' সাথে সাথেই আমার হৃদয়ে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে জ্ঞান দান করা হলো যে, 'এ ব্যক্তি মারা গেছে। আর কোন খবর ছিল না।'

আমি নিচে নেমে আসলাম। আমার ভাই এবং তার সাথে আরো ৭/৮ জন লোক বসেছিলেন। তারা ভাইয়ের চাকুরীর কথা বলছিলেন। আমি সেখানে বললাম, 'যদি পন্ডিত সাহাজরাম মারা যায় তবে তো তার পদটা একটা ভাল পদ'। তারা সবাই আমার কথা শুনে জোরে জোরে হাসতে লাগল। আমাকে বলল, 'তুমি কি একজন সুস্থ-সবল ব্যক্তিকে মেরে ফেলবে? দ্বিতীয় বা তৃতীয় দিন খবর হয়ে গেল যে, সেই সময়টাতেই সাহাজরাম হঠাৎ করেই মারা গেছে এবং এ জগৎ ত্যাগ করেছে" (তাযকিরাহ্ ঃ পৃঃ ৯)।

রূইয়া সাদেকা (সত্য-স্বপ্ন) সম্পর্কে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) লিখেছেন, "রূইয়া সাদেকা কোন কোন সময় সুস্পষ্ট কাশ্‌ফ হয়। একবার (আমাকে) জ্ঞাত করানো হয়েছিল, এক হিন্দু ক্ষত্রীয় (যার) নাম বিশ্বম্ভর দাস। এখনও সে কাদিয়ানে বসবাস রত। সে ফৌজদারী মামলায় বেকসুর খালাস পাবে না। তবে তার কারারুদ্ধ থাকার সময়-কাল কম করা হবে। কিন্তু তার সাথের কয়েদী খোশ্‌হালের কারাগারে থাকার সময়কাল কম করা হবে না। এ খোশ্‌হাল আজও কাদিয়ানে বসবাসরত আছে। সে শাস্তির পুরো সময় জেলে কাটাবে।"

কাশ্‌ফে বর্ণিত তথ্যের এ অংশের ব্যাপারে এমন পরীক্ষার সময় এসেছিল যে, চীফ কোর্ট থেকে যখন উক্ত মামলার নথিপত্র ফেরত এসেছিল তখন মামলায় জড়িতরা প্রচার করে দিল যে, এরা দু'জনেই মামলায় শাস্তি থেকে অব্যাহতি বা খালাস পেয়েছে। আমাদের সমস্ত অঞ্চলে প্রচার হয়ে গেল যে, উপরোক্ত দু'জন শাস্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তি বেকসুর খালাস পেয়ে গেছে। আমি তখন মসজিদে ইশার নামাযের জন্য প্রস্তুত ছিলাম। নামাযীদের মাঝে একজন বললেন, উপরোক্ত খবর প্রচার হয়ে গেছে এবং অভিযুক্ত ব্যক্তিদ্বয় গ্রামে ফেরত চলে এসেছে। আমি যেহেতু প্রকাশ্য বলে দিয়েছিলাম যে, তারা মুক্তি বা খালাস পাবে না, তাই আমার ভেতরে এক ধরনের কষ্ট ও দুঃখ অনুভব হোল, খুব যন্ত্রণাবোধ হতে থাকল। তখন আল্লাহ্‌তাআলা যিনি প্রত্যেক পদে পদে আমাকে সাহায্য ও সহযোগিতা করেন, আমাকে ইলহাম করে জানালেন, **লা তাখাফ্ ইন্নাকা আনতাল আ'লা** (অর্থ তুমি ভয় পেও না, তুমিই বিজয়ী হবে)।

নামাযের প্রারম্ভে বা নামাযের মাঝামাঝি সময়ে এ ইলহাম হলো। সকাল বেলা ফজরের পরপরই প্রকাশ হয়ে গেল যে, রাতে তাদের খালাস পাওয়ার খবর সম্পূর্ণ মিথ্যা ছিল এবং প্রকৃত সত্য প্রকাশ হলো যে, খাকসার যে রকম ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন- সে রকমই ঘটেছে" (তাযকিরাহ্ পৃঃ ১৩)।

হযরত মসীহ্ মাওউদ কাশ্‌ফের মাধ্যমে হযরত মসীহ্ ঈসা (আঃ)-এর সাথে দেখা সাক্ষাৎ করেছেন। এ সম্পর্কে হযরত সাহেব লিখেছেন, "প্রায় দশ বছর অতিবাহিত হয়েছে, আমি স্বপ্নে হযরত মসীহ্ ঈসা (আঃ)-এর সাথে দেখা করেছি; একত্রে একপাত্রে খাবার খেয়েছি। খাওয়ার সময় আমরা এমন স্বাভাবিক ও স্বাচ্ছন্দ্যে অকৃত্রিম ভালবাসার পরিবেশে খাবার খাচ্ছিলাম যেমন দু' সহোদার ভাই। যেমন বহু পুরাতন সম্পর্ক, বহুদিনের বন্ধু এবং আন্তরিকভাবে ঘনিষ্ঠ বন্ধু। তারপর এ গৃহে এ স্থানে যেখানে বসে আমি এ পাদটিকা লিখছি, আমি এবং মসীহ্ (আঃ) আর একজন কামেলবুযূর্গ, পূর্ণতাপ্রাপ্ত সৈয়্যদ, আলে রসূল এ সময় বড় আনন্দ ভরা চিত্তে আমরা একসাথে বেশ কিছু সময় দাঁড়িয়ে থাকলাম। সৈয়্যদ সাহেবের হাতে একখানা কাগজ ছিল, যার মাঝে উম্মতে মুহাম্মদীয়ার খাস খাস বুযূর্গ ব্যক্তির বেশ কয়েকজনের নাম লেখা ছিল। সেখানে তাঁদের সম্পর্কে আল্লাহ্‌তাআলার পক্ষ থেকে কিছু কিছু প্রশংসামূলক বাক্যও লেখা ছিল। সেই কাগজে যা লেখা ছিল সৈয়্যদ সাহেব পড়তে শুরু করলেন। লেখা থেকে বুঝা যাচ্ছিল যে, মসীহ্ (আঃ)-কে সেসব বুযুর্গ ব্যক্তির সম্পর্কে খবর দেয়া হচ্ছে যে, এরা উম্মতে মুহাম্মদীয়ার বুযুর্গানে দীন, এরা আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে এ ধরনের মর্যাদার অধিকারী। এবং সেই কাগজে যে প্রশংসা বাণী লেখা ছিল এগুলো সম্পূর্ণরূপে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে প্রদত্ত। যখন তিনি সেই কাগজ পড়তে পড়তে শেষ প্রান্তে পৌছে গেলেন, খুব সামান্য লেখা বাকী ছিল- সেখানে এ খাকসারের নাম আসল। সেখানে যে প্রশংসাবাক্য লেখা ছিল আরবী ভাষায় তা এ রকম ঃ **হুয়া মিন্নি বেমান্‌যিলাতে তওহীদি ওয়া তাফ্‌রীদি ফাকাদা আঁয়ইউরাফা বায়নান্ নাসে।**

অর্থ ঃ সে আমার কাছে এমন যেমন আমার তওহীদ (একত্ববাদ) ও আমার তাফরীদ (একাকিত্ব)।

সুতরাং শীঘ্রই মানবমন্ডলীর মাঝে তার সুখ্যাতি প্রচার করা হবে।" এই শেষ ব্যাখ্যাটুকু "শীঘ্রই সে মানুষের মাঝে সুখ্যাতি ও পরিচিতি পাবে এখনই ইলহাম আকারে আমার উপরে নাযেল হয়েছে।"

[বারাহীনে আহমদীয়া, রূহানী খাযায়েন, ১ম খন্ড; পৃঃ ২৮০; টীকার পাদটীকা নং ১]

অনুরূপভাবে হযরত মসীহ্ (আঃ) কাশ্‌ফের জগতে হযরত বাবা গুরু নানককে দেখেছেন। বাবা গুরু নানক স্বীকার করেছেন যে, লোকেরা তাঁর সম্পর্কে যা বলে তা মিথ্যা ও অযথা এবং এরা মৃতদের মাংস খায়। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) লিখেছেন ... আমি তাকে দেখেছি। তাইতো তাঁকে সম্মানের চোখে দেখি [বাবা গুরুনানক সাহেবকে] কারণ আমি জানি যে, বাবাও সেই ঝর্ণা হতে পান করতেন যে ঝর্ণা হতে আমরাও পান করি। আল্লাহ্ জানেন যে, আমি সেই মা'রেফতের কথা বলছি, যা আমাকে প্রদান করা হয়েছে।"

[ইশতিহার, ১৮ই এপ্রিল, ১৮৯৭ইং। তাযকিরাহ্, পৃঃ ১৬]

"আমি কাশ্‌ফের মাধ্যমে দেখলাম, 'এক ব্যক্তি আমার মনে হয় কোন ফিরিশ্‌তা হবে; কিন্তু কাশ্‌ফে মনে হোল তার নাম শের আলী, সে আমাকে শুইয়ে দিয়ে আমার চোখ বের করে পরিষ্কার করে তার মাঝ থেকে ময়লা ও দুষিত জিনিস বের করে ফেলে দিচ্ছে।" এটি সেই প্রকার কাশ্‌ফ যেমন আঁ হযরত (সঃ) দেখেছিলেন। ফিরিশ্‌তারা হুযূর (সঃ)-কে শুইয়ে দিয়ে তাঁর হৃদপিন্ড বের করে পরিষ্কার করেছিলেন। "এবং একটি উজ্জ্বল নূর যা চোখের মাঝেই ছিল- কিন্তু কিছু বস্তুর নিচে চাপা পড়েছিল, এখন পরিষ্কার করে সে একে বড় উজ্জ্বল তারকার মত বানিয়ে দিল এবং এ কর্ম সম্পাদন করে সে ব্যক্তি অদৃশ্য হয়ে গেল। তারপর আমি কাশ্‌ফের মাঝ থেকে বেরিয়ে জাগরণের দিকে আসলাম" (তাযকিরাহ্; পৃঃ ৩০, ৩১)।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) লিখেছেন,

"আমি একবার কাশ্‌ফের মাধ্যমে সূরা ফাতিহাকে গোলাপ ফুলের আকারে, দেখলাম। তাজা গোলাপ ফুল ফুটে আছে অতি চমৎকার রং ও সুবাস বের হচ্ছে।" হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) সূরা ফাতিহার তফসীর লিখেছেন এবং এ তফসীর সেই তাজা প্রস্ফুটিত গোলাপের তা'বীর" (তাযকিরাহ্, পৃঃ ৫৩, ৫৪)।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) লিখেছেন,

"আমি এখন যে এই পান্ডুলিপি পড়ে সংশোধন করছিলাম, তখনও এর কাজ শেষ

হয় নি ইতোমধ্যে কাশ্‌ফের মাধ্যমে আমাকে কতকগুলো পৃষ্ঠা দেখানো হোল, যার মাঝে লেখা আছে, "ফাতাহ্ কা নাক্কারাহ্ বাজে।" (অর্থ ঃ বিজয়ের ঘন্টা বাজে)। তারপর একজন হেসে সেই পৃষ্ঠাগুলোর অপর পিঠে একটি ছবি দেখাল এবং বলল, দেখ, তোমার এ ছবি কী বলছে! আমি দেখলাম, সেই ছবি আমারই ছবি ছিল; সবুজ পোশাক পরা। কিন্তু অত্যন্ত তেজদীপ্ত (চেহারা) যেমন কোন বিজয়ী অস্ত্রধারী জেনারেল। ছবির ডান ও বামে লেখা আছে, 'হুজ্জাতুল্লাহেল কাদের ওয়া সুলতান আহমদ মুখতার।" এটা ছিল, ১৯শে যিলহাজ্জ ১৩০০ হিঃ মোতাবেক ১২ অক্টোবর, ১৮৮৩ইং তারিখের ঘটনা।"

(বারাহীনে আহমদীয়া; রূহানী খাযায়েন, ১ম খন্ড; পৃঃ ৫১৫ টীকার পাদ টীকা নং ৩)

"একবার আমার মনে আছে, আমি কাশ্‌ফের জগতে দেখলাম, কতকগুলো ঐশী সিদ্ধান্ত (তকদীরের বিষয়) আমি নিজ হাতে সেগুলো লিখেছি- ভবিষ্যতে সেগুলো ঘটবে, তারপর মহাপ্রতাপশালী খোদাতাআলার সামনে পেশ করেছি এখানে স্মরণ রাখা দরকার যে, সত্য-স্বপ্ন বা কাশ্‌ফের জগতে অনেক সময়ই এমন হয়ে যে, আল্লাহ্‌র কোন কোন জামালী ও জালালী সিফত মানুষের চেহারায় কাশ্‌ফ দ্রষ্টার সামনে রূপকভাবে প্রকাশিত হয়। রূপকভাবে সে মনে করে যে, আমি বাস্তবে আসল মহান আল্লাহ্‌কে দেখছি। যারা কাশ্‌ফ দেখার অভিজ্ঞতা রাখেন তাদের কাছে বিষয়টি প্রকাশিত ও পরিচিত এবং জানা সত্য। কাশ্‌ফ দ্রষ্টারা অস্বীকার করতে পারেন না। হ্যাঁ, বলছিলাম, আল্লাহ্‌র জামালী সিফতকে মানুষের কল্পনা শক্তির মাঝে খোদাতাআলাকে দেখে বলেই সে মনে করে। অতএব, আল্লাহ্‌তাআলা পরম পবিত্র, আল্লাহ্‌র সামনে সেই তকদীরের লেখন পেশ করা হলো, তিনি যিনি একজন ক্ষমতাশীল শাসকের আকৃতি ধারণ করেছিলেন, নিজ কলমকে লাল কালির দোয়াতে ডুবিয়ে তারপর কলমকে আমার দিকে ঝেড়ে নিয়ে, অতিরিক্ত কালি ঝেড়ে ফেলে, কলমের মাথায় যে কালি ছিল তা দিয়ে সেই তকদীরের লিখনের (বইয়ের) উপর দস্তখত করেছিলেন। সাথে সাথে কাশ্‌ফের অবস্থা দূর হয়ে গেল। তারপর আমি বাস্তবে চোখ খুলে দেখলাম, সেই লাল কালি কলমকে যে ঝেড়ে ফেলা হয়েছিল সেই লাল কালি বাস্তব জগতে আমার কাপড়েও কোন কোন স্থানে পড়েছিল এবং একদম তাজা কালি, ভেজা কালি ছিল। সেই সময় আব্দুল্লাহ্ নামের এক ব্যক্তি পাটিয়ালা রাজ্যের সন্নৌওর গ্রামের অধিবাসী আমার কাছে বসেছিল, তার টুপির উপরও কয়েক ফোঁটা কালি পড়েছিল।" এখন কেউ যদি বলে যে, হযরত মির্যা সাহেবের শরীরের কোন রক্তের ফোটা হবে হয়ত।" তার উত্তর এই যে, তাহলে আব্দুল্লাহ্ স'ন্নৌবীর মাথার টুপিতে তা কীভাবে গিয়ে পড়ল। সেই কামরার ছাদও দেয়াল পরীক্ষা করে দেখা হয়েছে যে, সেখানে কোন টিকটিকি অথবা পোকা বা কিছু ছিল না, যার রক্ত হতে পারত। হয়ত টিকটিকির লেজ কাটা যেতে পারে। কিন্তু না এমন কিছু ছিল না। সুতরাং কাশ্‌ফের জগতের সেই লাল কালি যা বাস্তব জগতে প্রকাশ পেয়েছিল। এ ধরনের আরো অনেক কাশ্‌ফ রয়েছে, সবগুলো উল্লেখ করা অনেক দীর্ঘ বিষয় হয়ে যাবে, প্রত্যক্ষ করা গেছে।" (সুরমা চশমায়ে আরিয়া; পৃষ্ঠা ১৩১, ১৩২, টীকা)

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর কাছ থেকে সেই জামা আব্দুল্লাহ্ সন্নৌরী সাহেব চেয়ে নিয়েছিলেন যার উপর কাশ্‌ফের সেই লাল কালির ছিটা পড়েছিল। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর মনে ধারণা হয়েছিল পরবর্তীতে সেই জামাটা নিয়ে শির্‌ক পয়দা হতে পারে। তাই তিনি শর্ত আরোপ করেছিলেন সেই জামাটা যেন তাঁর সাথে তাঁর কবরে দাফন করে দেয়া হয়। অতএব, সেই মত হযরত আব্দুল্লাহ্ সন্নৌরী (রাঃ)-এর সাথে তাঁর কবরে সেই জামা দাফন করা হয়েছে।

১৮৮৭ইং সনের একটি কাশ্‌ফ সম্পর্কে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) লিখেছেন, মৌলভী মোহাম্মদ হোসেন বাটালবী সাহেবের এক ইংরেজী পড়া দোস্ত নাম নজফ আলী (যে কাবুলেও গিয়েছিল এবং সে সম্ভবতঃ এখনও জীবিত আছে) আমার কাছে এসেছিল। তার সাথে আমার ভাই মির্যা খোদাবখ্‌শ সাহেবও ছিলেন। আমরা তিনজন বাইরে বেড়াতে গিয়েছিলাম। রাস্তায় আমি কাশ্‌ফের মাধ্যমে জানতে পারলাম, এই নজফ আলী সাহেব আমার বিপক্ষে নেফাক পূর্ণ (বিশ্বাসের) কিছু কথা বলেছে। আমার এহেন কাশ্‌ফের কথা তাকে বলা হ'ল। সে স্বীকার করেছিল, "হ্যাঁ একথা ঠিক।" আমি আপনার বিরুদ্ধে কথা বলেছি" (তাযকিরাহ্; পৃঃ ১৪৮)।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলেছেন, "বহুবার বিভিন্ন যুগের গউস, কুতুবরা আমার কাশ্‌ফের মাধ্যমে আমার সাথে দেখা করেছেন যারা আমার প্রতি বিশ্বাস ও ঈমান এনেছেন এবং আগামীতেও ঈমান আনবেন।" [তাযকিরাহ্; পৃঃ ১৬২]। ঘটনা এরকম যে, কোন কোন গউসের কবরে দাঁড়িয়ে দোয়া করা হয়েছিল- তখন তারা কবর ফেটে বেরিয়ে এসেছেন এবং হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর সত্যতার সমর্থন করেছেন কাশ্‌ফের মাঝেই। একবার খুব পরিষ্কার ও সুস্পষ্ট কাশ্‌ফের মাধ্যমে আমাদের কাছে প্রকাশ করা হয়েছে যে, হারেস নামের এক ব্যক্তি অর্থাৎ হাররাস্ (বড় জমিদার) আগমন করবেন, আবূ দাউদ হাদীস গ্রন্থে যার কথা লেখা আছে, এ খবর সঠিক। এ ভবিষ্যদ্বাণী এবং মসীহ্‌র আগমনের ভবিষ্যদ্বাণী প্রকৃত অর্থে একই ব্যক্তির মাধ্যমে পূর্ণতাপ্রাপ্ত হবে। অর্থাৎ উভয়ে মূলতঃ একই ব্যক্তি হবেন এবং সেই ব্যক্তি আমি এই খাকসার" (তাযকিরাহ্, পৃঃ ১৭৬)।

অনুরূপভাবে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলেছেন,

আল্লাহ্‌তাআলা আমাকে এক কাশ্‌ফের মাধ্যমে খবর দিয়েছেন যে, সূরা আসর-এর অক্ষরগুলোর মান [আবজাদ-এর হিসাবে] একত্র করলে দেখা যায়, চার হাজার সাতশ' উনচল্লিশ বছর হয়। পৃথিবীর আরম্ভ থেকে আঁ হযরত (সঃ)-এর ইনতেকাল পর্যন্ত চন্দ্র বছরের হিসাবে এত বছর নয়।"

[তোহফায়ে গোলড়বীয়া. রূহানী খাযায়েন; ১৭ তম খন্ড, পৃঃ ২৫১; তাযকিরাহ্; পৃঃ ১৭৯]

'কাশ্‌ফের অবস্থায় আমি দেখলাম, মানুষের আকৃতির দু'জন ব্যক্তি এক ঘরে বসে আছে। একজন মাটিতে অপরজন ছাদের কাছে বসে আছে। যে ব্যক্তি মাটিতে বসে আছে আমি তাকে উদ্দেশ্য করে বললাম, 'এক লক্ষ

সৈন্যের প্রয়োজন আছে আমার।' কিন্তু সে চুপ করে থাকল কোন জবাব দিল না। এবার আমি অপর ব্যক্তি যে ছাদের কাছে এবং আকাশের দিকে বসে ছিল তাকে উদ্দেশ্য করে বললাম, আমার এক লক্ষ সৈন্যের প্রয়োজন আছে।" সে আমার কথা শুনে বলল, 'এক লক্ষ পাবে না, তবে পাঁচ হাজার সিপাহী দেয়া হবে।"

সুতরাং এই পাঁচ হাজার সৈন্য হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-কে দেয়া হয়েছে।" সেই কাশ্‌ফের ফলস্বরূপ। এই পাঁচ হাজার তো সেই যুগে ছিল, এখন তো অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। এর অর্থ ওয়াকেফীনে যিন্দেগী (উৎসর্গকৃত যাদের জীবন)। আর যদি সকল দেশের এমন সকল মানুষ যারা ওয়াক্‌ফে-এর (উৎসর্গীকৃত) রূহ নিয়ে জামাতের কাজ করে যাচ্ছেন তাদের হিসাব করেন তবে প্রায় এক লক্ষের কাছাকাছি হবে এদের সংখ্যা। "আমি তখন নিজের মনে মনে বললাম, 'যদিও এই পাঁচ হাজার মানুষ সংখ্যায় অল্প তবুও আল্লাহ্ যদি চান তবে এই অল্প মানুষেরাই অনেক বড় সংখ্যার মানুষের উপর বিজয় পেতে পারে। তখন আমি এ আয়াত পড়লাম।

كَمْ مِّنْ فِئَةٍ قَلِيْلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيْرَةً بِإِذْنِ اللّٰهِ

(অর্থাৎ কত ছোট ছোট দল আল্লাহ্‌র আদেশে বড় বড় দলের উপর জয়যুক্ত হয়েছে (সূরা বাকারা ঃ ২৫০) (তাযকিরাহ্ পৃঃ ১৭৮)।

১৮৯১ইং সনে আমার কাছে কাশ্‌ফের মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়েছে যে, সেই যুগ যে যুগে অস্বীকার ও অবাধ্যতার চরম অবস্থা হবে সে যুগ আরম্ভ হবে ১২৭৪ হিজরী থেকে এবং এ হিসাব নিহিত আছে আয়াত, "ওয়া ইন্না 'আলা যাহাবিম বিহী লাকাদেরুনা" এর হরূফে আবজাদের হিসাব মতে।" (নিশ্চয় আমরা তাকে উঠিয়ে নিতেও সক্ষম)।" (সূরা মু'মিনুন) এবং এটাই হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর আগমনের যুগ (তাযকিরাহ্, পৃঃ ১৮৫)।

১৮৯১ইং-এর একটি কাশ্‌ফ "মৌলভী মোহাম্মদ হোসেন বাটালবী সাহেব যখন আমাদের বিরুদ্ধে কুফরী ফতওয়া দিল, লোকদেরকে আমাদের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করতে লাগল যে, এরা মুসলমান নয়, এদের জানাযা পড়া উচিত নয়; মুসলমানদের কবর স্থানে এদেরকে যেন দাফন করা না হয়। সে সময় তারা সবাই আমাদের বিরুদ্ধে চরম শত্রু হয়ে গেল আমরা যেমন একা হয়ে গেলাম। সেই সময় আমি কাশ্‌ফের মাধ্যমে দেখলাম, 'আমার বড় ভাই মরহুম গোলাম কাদেরের আকৃতিতে এক ব্যক্তি এসেছে, আমাকে তৎক্ষণাৎ জানানো হয়েছে যে, ইনি ফিরিশ্‌তা'। আমি বললাম, 'তুমি কোথা থেকে এসেছ?' সেই ব্যক্তি বললেন, 'আমি হযরতে বারীতাআলার পক্ষ থেকে এসেছি'। আমি বললাম 'কেন?' সে বলল, 'অনেক লোক তোমার কাছ থেকে পৃথক হয়ে গেছে এবং তোমার শত্রুতায় তারা অনেক বেশি অগ্রসর হয়েছে। আমি একটি পয়গাম দিতে এসেছি। আমি তাকে আলাদা করে একটি কথা বলতে চাইলাম। যখন সে পৃথক হয়ে আসল আমি তাকে বললাম, 'লোকেরা তো আমার থেকে আলাদা হয়ে দূরে সরে গেছে, কিন্তু তুমিও কি পৃথক হয়ে গেছ?' সে বলল, 'না, আমরা তোমার সাথেই আছি।' তারপর কাশ্‌ফের অবস্থা দূর হয়ে গেল" (তাযকিরাহ্; পৃঃ ১৮৮)।

একবার কাশ্‌ফে আমি দেখলাম, 'আমি নূতন পৃথিবী ও নতুন আকাশ সৃষ্টি করেছি। তারপর আমি বলছি, 'এস, এবার আমরা মানুষ সৃষ্টি করি। এ কথা শুনে নির্বোধ মৌলভীরা বড় শোরগোল করল যে, দেখ, এবার এ খোদা হবার দাবী করছে। অথচ কাশ্‌ফ-এর তাৎপর্য এই ছিল যে, আল্লাহ্ আমার হাতে এমন এক পরিবর্তন সাধন করবেন যেমন আকাশ এবং পৃথিবী নতুন হয়ে থাকে। এবং প্রকৃত মানুষ সৃষ্টি হবে' (তাযকিরাহ্; পৃঃ ১৯৩)।

এটি একটি কুরআন শরীফের বাগধারার মত। যেমন আঁ হযরত (সঃ)-কে আল্লাহ্ বলেছেন, **ওয়ামা রামায়তা ইয রামায়তা ওয়ালাকিন্নাল্লাহা রামা** "যখন তুমি এক মুষ্টি কংকর ছুঁড়ে মেরেছিলে তো তুমি ছুঁড়নি না বরং আল্লাহ্ ছুঁড়েছিলেন" (সূরা আনফাল ঃ ১৮)।

তারপর আছে **ইয়াদুল্লাহে ফওকা আইদিহিম** অর্থাৎ তাদের হাতের উপর আল্লাহ্‌র হাত" (সূরা ফাতাহ্ ঃ ১১)। মু'মিনদের হাতের ওপর আঁ হযরত (সঃ)-এর হাত ছিল। কিন্তু বলা হয়েছে, 'তাদের হাতের উপর আল্লাহ্‌র হাত ছিল।' অতএব এ তো কুরআন শরীফে ব্যবহৃত বাগ্‌ধারা। এর অর্থ কখনই শির্‌ক হয় না।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) লিখেছেন,

"কিছুদিন পূর্বের ঘটনা। আমার মনে চিন্তা আসল যে, 'হাদীস, "আল আয়াতো বা'দাল মিআতায়নে" (অর্থঃ দু'শ বছর পরে বিশেষ নিদর্শন প্রকাশ পাবে) এর এক উদ্দেশ্য এটা হতে পারে কি না যে, ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষে হযরত ইমাম মাহ্‌দী ও মসীহ্ মাওউদ যাহির হবেন এবং এ হাদীসের মর্মার্থের মাঝে আমার কথা আছে কি না? আমাকে কাশ্‌ফের মাধমে ইঙ্গিত দেয়া হোল যে, নিম্নে উল্লেখিত নামের অক্ষরগুলোর মান (আবজাদের হিসাবে) নির্ণয় করলে দেখা যাবে যে, এর মাঝে এই মসীহ্ (মাওউদ)-এর ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষে প্রকাশের কথা আছে, তার নামের মাঝে আগে থেকেই তারিখ নির্ধারণ আমরা করে রেখেছি। এবং সে নাম, "গোলাম আহমদ কাদিয়ানী।" এ নামে ব্যবহৃত অক্ষরের মান অর্থাৎ সংখ্যা যোগ করলে পুরোপুরি ১০০০ হয়। এ শহর কাদিয়ানে আমি ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তির নাম গোলাম আহমদ নেই। বরং আমার অন্তরে এল্‌কা (প্রবেশ করানো) করা হয়েছে যে, আমি ব্যতীত সমগ্র পৃথিবীতে অন্য কোন ব্যক্তির নাম "গোলাম আহমদ কাদিয়ানী" নেই। আল্লাহ্‌র ইচ্ছা, অধিকাংশ সময় আল্লাহ্ আমাকে (তিনি পবিত্র) অনেক গোপন রহস্য এভাবে হুরূফে আবজাদের হিসাবের মাধ্যমে অবগত করিয়ে থাকেন" (ইযালায়ে আওহাম, রূহানী খাযায়েন; ৩য় খন্ড, পৃঃ ১৮৭)।

১৮৯২ইং-এর একটি কাশ্‌ফ সম্পর্কে আছে, "আমাকে কাশ্‌ফের মাধ্যমে বারবার জানানো হয়েছে যে, 'আমার নাম গাজী রাখা হয়েছে' (তাযকিরাহ্ পৃঃ ১৯৬)।

১৮৯২ইং "আমার কাছে কাশ্‌ফের মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়েছে যে, এই বিষাক্ত বাতাস খৃষ্টান জাতির কারণে পৃথিবীতে সৃষ্টি হয়েছে। হযরত ঈসা (আঃ)-কে এর খবর দেয়া হয়েছে। (এ খবর পেয়ে) হযরত ঈসার রূহ্

আধ্যাত্মিকভাবে নুযূলের (নেমে আসার) জন্য উত্তেজিত হয়েছে। সে উত্তেজিত হয়ে, নিজ জাতির লোকদের মাঝে ফেৎনা ও ধ্বংসের আলামত দেখে [ঈসা (আঃ)-এর রূহ] চেয়েছে যে, পৃথিবীতে তাঁর একজন (কায়েম মকাম) স্থলাভিষিক্ত তারই অনুরূপ হোক সে যেন ঠিক তার মতই হয় এমন যেমন সে নিজেই (এসে গেছে)। সুতরাং তাকে আল্লাহ্‌তাআলা নিজ অঙ্গীকার অনুসারে এমন একজনকে তার প্রতিচ্ছবি (অনুরূপ) করে দিলেন। এর মাঝে মসীহ্ ঈসা (আঃ)-এর মতই সৎসাহস, তারই চরিত্র, তারই রূহানীরূপ প্রদান করা হলো। এর মাঝে খুব শক্তির সাথে খুব বেশি পরিমাণ (আসল মসীহ্‌র অনুরূপ) মিল প্রদান করা হলো। এ রকম যেমন তারা দু'জন একই জওহর একই ক্ষমতার দু'দুটি অংশ করা হলো এবং মসীহ্ ঈসার প্রবল আকর্ষণ এর মাঝে কেন্দ্রীভূত হলো যেমন সে নিজে এর মাঝে এসে নিজ কর্ম সম্পাদন করতে চাইতেন। এভাবে এর সত্তা এবং অস্তিত্ব (ঈসার প্রতিচ্ছবির অস্তিত্ব) মসীহ্ ঈসার সত্তা বা অস্তিত্ব হয়ে এবং ঈসার প্রবল আকাঙ্ক্ষা ও ইচ্ছা এর মাঝে নাযেল হলো যার নুযূল (অবতরণকে) ঈসার নুযূল বা (ইলহামের রূপক ভাষায়) ঈসার অবতরণ বলে গণ্য হলো" (তাযকিরাহ্; পৃঃ ২০৯)।

অর্থাৎ হযরত মসীহ্ মাওউদ (প্রতিশ্রুত মসীহ্) (আঃ)-এর নুযূল বা (অবতরণ)।

লিখেছেন, "আমি বার বার ঈসা (আঃ)-কে স্বপ্নে দেখেছি। বহুবার কাশ্‌ফের জগতে কাশ্‌ফের মাঝে তার সাথে সাক্ষাৎ হয়েছে। একই টেবিলে আমার সাথে তিনি খেয়েছেন। একবার আমি তাঁকে দেখলাম এবং এই ফেৎনা সম্পর্কে তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম যার মাঝে তার জাতি (খৃষ্টান) পতিত হয়েছে। তাঁর উপর ভীতি সঞ্চার হয়ে গেল এবং তিনি আল্লাহ্‌র আযমত (বৃহত্তর হওয়া) আল্লাহ্‌র পবিত্রতা তসবীহ্ ও তাহমীদ করতে লাগলেন। মাটির দিকে ইঙ্গিত করে বললেন, 'আমি মাটির মানুষ তাদের অন্যায় অভিযোগ থেকে আমি মুক্ত যা তারা আমার উপর আরোপ করেছে। অতএব আমি তাঁকে (ঈসাকে) বড় নম্র এবং বিনয়ী নিরহংকার মানুষ হিসেবে দেখেছি" (তাযকিরাহ্; পৃঃ ২৫৩)।

আবার লিখেছেন, "কাশ্‌ফের মাধ্যমে একদম জাগ্রত অবস্থায় মৃত ব্যক্তিদের সাথে আমার দেখা হয়েছে বারবার। আমি অনেককে যারা ফাসেক ও গুমরাহ্ ব্যক্তি তাদেরকে কালো এমন কালো ধূয়ার মত শরীরে দেখেছি যেমন তাদের শরীর ধূয়া দিয়ে বানানো" (তাযকিরাহ্; পৃঃ ২৯০)।

ইসলামী উসুল কি ফিলোসফী (ইসলামের নীতি দর্শন) সম্পর্কে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-কে কাশ্‌ফের মাধ্যমে যে বিজয়ের শুভ সংবাদ দেয়া হয়েছিল এবং তা বড় গৌরবের সাথে পূর্ণতা পেয়েছিল। এ সম্পর্কে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) লিখেছেন, "কাশ্‌ফের মাধ্যমে এ সম্পর্কে আমি দেখলাম, আমার প্রাসাদের উপর অদৃশ্য থেকে একটি হাত মারা হোল। হাতের আঘাতে সেই প্রাসাদে একটি নূরের ঝর্ণা সৃষ্টি হোল এবং আশপাশে তা বিস্তার লাভ করল। আমার হাতের উপরেও সেই নূরের আলো এসে পড়ল। তখন আমার পাশে যে ব্যক্তি দাঁড়ানো ছিল সে উচ্চস্বরে বলে উঠল, "আল্লাহু আকবর খরেবত খায়বার"এর (তাবির) ব্যাখ্যা এই ছিল যে, সেই প্রাসাদের অর্থ আমার হৃদয় যেটা আল্লাহ্‌র নূরের অবতরণ স্থল এবং সেই নূর অর্থ কুরআনের (মা'রেফত) তত্ত্বজ্ঞান। খায়বার অর্থ সব নষ্ট ধর্মসহ যার মাঝে শিরক ও মিথ্যার মিশ্রণ আছে। মানুষকে আল্লাহ্‌র স্থান দেয়া হয়ে তথা আল্লাহ্‌র সেফাতসমূহ যথাস্থান ও মর্যাদা থেকে নীচে নামিয়ে ফেলা হয়েছে।

আমাকে বিশ্বাস করানো হয়েছে যে, এ প্রবন্ধ (উক্ত গ্রন্থ) প্রকাশ ও প্রচার হলে মিথ্যা ধর্মগুলোর মিথ্যা হওয়া স্পষ্ট হয়ে যাবে এবং কুরআনের সত্যতা দিন দিন পৃথিবীতে প্রচার লাভ করতে থাকবে যতদিন না সমগ্র পৃথিবীকে আচ্ছন্ন করে ফেলে। তারপর কাশ্‌ফের অবস্থা ইলহামের রূপান্তরিত হয়ে যায় এবং আমার প্রতি ইলহাম করা হয়।" **ইন্নাল্লাহা মায়াকা। ইন্নাল্লাহা ইয়াকুমো আয়নামা কুমতা** অর্থ ঃ নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমার সাথে আছেন, নিশ্চয় আল্লাহ্ সেখানে দাঁড়ান যেখানে তুমি দাঁড়াও।" এটা আল্লাহ্‌র সমর্থন ব্যক্ত করার জন্য রূপক ভাষায় বলা হয়েছে।

(আন্‌জামে আথম, পৃঃ ২৯৯ টীকা তাযকিরাহ্, পৃঃ ২৯০)

উপরোক্ত ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণতা লাভ করেছে, কেউ যদি কুধারণা পোষণকারী হয় তবে সে হয়ত অস্বীকার করতে পারে। 'ইসলামী উসুল কি ফিলোসফি' এমন একখানা কিতাব যার সম্পর্কে টলস্টয় সেই যুগে বলেছিলেন, 'কোন অসাধারণ মহান মানুষের হাতের লেখা কিতাব। কোন সাধারণ কিতাব নয়। আজ সারা পৃথিবীতে এ কিতাব একথার সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, আল্লাহ্‌তাআলা কাশ্‌ফের মাধ্যমে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন সে প্রতিশ্রুতি সঠিকভাবে পূর্ণতা পেয়েছে'।

১৮৯৭ইং সনের ইলহাম, "নাফাখ্‌তো ফিকা মিল্লাদুনী রূহাস্‌সিদকে" ... অর্থঃ তোমার মধ্যে আমি আমার পক্ষ থেকে সত্যের রূহ্ ফুঁকে দিয়েছি । ..."

এখানে যে শব্দ লাদুন (মিল্‌লাদুননি) ব্যবহার করা হয়েছে- এর ব্যাখ্যা বা তাৎপর্য কাশ্‌ফের মাধ্যমে জানানো হয়েছে যে, একজন ফিরিশ্‌তা স্বপ্নের মধ্যে বলছে, "এ 'মকাম' (স্থান) 'লাদুন' যেখানে তোমাকে পৌছানো হয়েছে; এমন মকাম বা স্থান যেখানে সর্বদা বৃষ্টি হচ্ছে। এখানে সর্বদা বৃষ্টি হতেই থাকে। কখনও এক সময়ও বৃষ্টি থামে না" (তাযকিরাহ্; পৃঃ ২৯৯)।

এখানে ইংল্যান্ডেও একটি লুড গেট (Lud Gate) আছে যেখানে ধর্মীয় তর্ক-বিতর্ক হতেই থাকে। ইংল্যান্ডের লুড গেটের ব্যাখ্যা আমার বোধগম্য হয়েছে এ রকম যে, এখানে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর অনুগতরা ধর্মীয় বিতর্কে বিরাট বিরাট বিজয় লাভ করবেন।

"কাশ্‌ফের মাধ্যমে আমি দেখলাম, 'পৃথিবীর মাটি আমার সাথে কথা বলেছে, 'ইয়া ওয়ালী আল্লাহ্! কুনতো লা আরেফোকা" হে আল্লাহ্‌র বন্ধু! আমি তোমাকে চিনতাম না" (তাযকিরাহ্; পৃঃ ২৯৯)।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর বিরুদ্ধে সরকারী ট্যাক্স (কর) ধার্য করার বহু চেষ্টা চালানো হয়েছে। হযরত (আঃ) একবার দেখলেন, এক হিন্দু তহসীলদার বাটালা,

হযরতের (আঃ) ওপর কর অবশ্যই বসাতে দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ। হযরত (আঃ) কাশ্‌ফে দেখলেন, সেই হিন্দু তহসীলদারের বদলীর আদেশ হয়ে গেছে এবং তার স্থলে একজন মুসলমানকে তহসীলদার বানানো হয়েছে, যে ন্যায্য ফয়সালা করবে।" অনেক মানুষকে এ কাশ্‌ফ সম্পর্কে বলে দেয়া হয়েছিল। সেখানে যেসব নাম দেখানো হয়েছিল তার মাঝে ইনস্‌পেক্টর মাদ্রাজ, জম্মু ও কাশ্মীর, খাজা জামাল উদ্দিন সাহেবের নামও ছিল। বাস্তবে এমনই ঘটেছিল যেমন কাশ্‌ফে হযরত (আঃ)-কে দেখানো হয়েছিল ডেপুটি কমিশনার বাহাদুর গুরুদাসপুরকে রিপোর্ট পাঠানো হোল। ফয়সালা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর পক্ষে হয়ে গেল।' (তাযকিরাহ্; পৃঃ ৩১৮-৩১৯)

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) কাশ্‌ফে দেখলেন, "একবার আমরা শ্রীকৃষ্ণকে দেখলাম। তিনি কৃষ্ণবর্ণের ছিলেন। নাক পাতলা, কপাল প্রশস্ত। শ্রীকৃষ্ণ উঠে দাঁড়িয়ে তার নাক আমার নাকের সাথে, তার কপাল আমার কপালের সাথে মিলিয়ে দিলেন" (আল্ হাকাম, ৬ই মার্চ, ১৯০৮ইং, তাযকিরাহ্; পৃঃ ৩৮১)

আমার নিউজিল্যান্ড যাবার সুযোগ হয়েছে। সেখানে দেখলাম এই রীতি। আমি বুঝতে পারছিলাম না যে, এ কি ঘটনা। তারপর হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) এই কাশ্‌ফের ঘটনা পড়ে বুঝতে পারলাম যে, অতীতকালে এ রকম রীতি ছিল। আমি যখন সেখানকার সরদারের সাথে সাক্ষাৎ করলাম, দেখি তারা উঠে আমার কপালের সাথে তাদের কপাল ও আমার নাকের সাথে তাদের নাক মিলিয়ে ঘষা দিচ্ছেন। আমি তখন আশ্চর্য হয়েছিলাম, বুঝতে পারি নি। এখন এ কাশ্‌ফ পড়ে বুঝলাম যে, অতীতের প্রচলন ছিল।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) লিখেছেন,

"আমরা কাশ্‌ফে দেখেছি যে, কাদিয়ান একটি বিশাল মহানগরে পরিণত যতদূর দেখা যায়- দূর দূর পর্যন্ত বাজার বিস্তৃতি লাভ করেছে। সুউচ্চ ভবনগুলো দু' দু চার চার তল বিশিষ্ট এবং তার চেয়েও বেশি উঁচু উঁচু কক্ষে দোকান সাজানো খুব ভাল বিল্ডিং বানানো হয়েছে। মোটামুটি শেঠরা, বড় বড় পেটবিশিষ্ট ব্যবসায়ীরা দোকান করছে বাজারকে সৌন্দর্যমন্ডিত করতে তাদের সামনে, হীরা, মতি, দামী দামী পাথর, লাল, টাকা আশরাফীর ঢের লেগে আছে। বিভিন্ন প্রকার দোকানে বিভিন্ন ধরনের সুন্দর সুন্দর আসবাবপত্র, জিনিসপত্র ঝলমল করছে, ঝক্‌ঝক্ করছে। ঘোড়াগাড়ী, টমটম, পালকী, বিভিন্ন প্রকার যানবাহনে, পায়ে হেঁটে মানুষ বাজারে যাতায়াত করছে। এত ভীড় যে কাঁধের সাথে কাঁধ লেগে যাচ্ছে- আগে যাওয়ার পথ মুস্কিলে পাওয়া যায়।" (তাযকিরাহ্; পৃঃ ৩৯৩) পীর শিরাজুল হক নোমানী (রাঃ) লেখা থেকে, আল্ হাকাম ৩০ এপ্রিল, ১৯০২ইং)

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) লিখেছেন, আমি একবার আল্লাহ্‌তাআলাকে (মানুষের) আকৃতিতে দেখলাম; আমার গলায় হাত দিয়ে পেঁচিয়ে ধরে আমাকে বললেন, "জে তু মেরা হো র‍্যহেঁ সব জাগ তেরা হো" যদি তুমি আমার হয়ে থাক, সমস্ত পৃথিবী তোমার হবে" (তাযকিরাহ্; পৃঃ ৪৭১)। এটা অতিরিক্ত ভালবাসা প্রকাশ যে, 'যদি তুমি আমার হয়ে যাও, তবে সারা জগৎ তোমার হয়ে যাবে।' একথা তো সত্য যে, আল্লাহ্‌কে যে পেয়ে গেছে সেসব কিছু পেয়ে গেছে।"

এ প্রসঙ্গে আমার মনে হোল, আপনাদেরকে বুঝিয়ে বলি যে, দোয়া করবেন দোয়ার সময় এই বলে যে, আল্লাহ্ যেন হৃদয়কে সকল প্রকার লোভ-লালসা থেকে, কামনা-বাসনা থেকে খালি করে দেন। এটি সর্বশ্রেষ্ঠ দোয়া। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আওওয়াল (রাঃ) নিজের একটি ঘটনা লিখেছেন। কাশ্মীর রাজ্যের পথে চলতে চলতে একদিন দেখলেন একজন ফকীরকে। সে নেংটি পরে আছে, খুব লম্ফ, ঝম্প করছে, খুশীতে আটখান হচ্ছে বলছে, আমি আজ খুব খুশি, খুব আনন্দ পাচ্ছি। হযরত খলীফা আওওয়াল (রাঃ) জিজ্ঞেস করলেন, (হযরত সাহেব তখন খলীফা ছিলেন না) হাকীম নূরুদ্দীন সাহেব জিজ্ঞেস করলেন, তুমি এমন কি পেয়েছ যে, এত খুশী হোচ্ছ? তোমার পরনে তো সেই নেংটি যা আগেও ছিল। তোমার কাছে তো আর কিছুই দেখছি না! সে বলল, যার সমস্ত আশা-আকাঙ্ক্ষা-ইচ্ছা পূরণ হয়ে যায় সে কেন খুশী হবে না? তারপর সে বলল, সমস্ত আকাঙ্ক্ষা কী পূরণ হয়েছে। বলল, যার অন্তরে কোন আকাঙ্ক্ষা বা চাওয়া-পাওয়াই না থাকে- তার সব আকাঙ্ক্ষা পূরণ হয়েছে।" সুতরাং দোয়া করা উচিত হৃদয়ে যেন কোন কামনা-বাসনাই না থাকে। প্রকৃত সংযম যেন লাভ হয়।

এবার আমি একজন কন্যা সন্তানের এক পত্রের সারসংক্ষেপ আপনাদের শোনাতে চাই। একটি মেয়ে বড় ব্যথা-বেদনা ভরা পত্র লিখেছে আমাকে। লিখেছে, "আমার বিয়ে হয়েছে। আমার মা-বাবা গরীব, তারা আমাকে কোন কিছু দিতে পারে নি। আমার শ্বশুর বাড়ীতে সব সময় আমাকে কথা শুনতে হয়। এমন মেয়ে সে কি এনেছে? কিছুই তো আনে নি। ফুটো পয়সাও তার কাছে নেই। আমার অন্তর সর্বদা এত ব্যথা ও যন্ত্রণা ভোগ করে যে, কেবল আপনাকেই বলতে পারছি। আল্লাহ্‌তাআলা জানেন যে, আমার অন্তরের কি অবস্থা!"

সুতরাং আজকের খুতবার শেষে আপনাদেরকে উপদেশ দিতে চাই যে, প্রথমতঃ উপহার-উপঢৌকনকে কখনও গুরুত্ব দেবেন না। বাবার যেমন অবস্থা সে তেমন করেই মেয়েকে বিদায় দিবে। কন্যা তো নিজেই উপহার! তার কাপড়, গহনা ইত্যাদি উপহার নয়। কন্যারা সুন্দর চেহারা, সুন্দর চরিত্রের হোক- এটা সবচেয়ে বড় উপহার। অতএব কন্যা দেখে কন্যাকে বিয়ে করবেন। আগের থেকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে যে, ভাল কন্যা, ভাল মেয়ে দেখে বিয়ে করবেন। দেখবেন মেয়ে সংসার করতে পারবে কিনা। তারপর উপহার বা যৌতুকের দাবী সম্পূর্ণ নাজায়েয। হযরত নবীয়ে করীম (সঃ)-এর সুন্নতের উপর আমল করুন। হুযূর (সঃ) কেমন করে কেবল সাদা কাপড়ে কন্যা বিদায় করেছিলেন। কোন উপহার বা যৌতুকের মাল সাথে দেন নি। আল্লাহ্ আমাদিগকে এর তৌফীক দান করুন।

(আল ফযল ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন, ২১ ফেব্রুয়ারী, ২০০৩ইং)

অনুবাদ - মাওলানা মুহাম্মদ ইমদাদুর রহমান সিদ্দিকী
মুরব্বী সিলসিলাহ্

মসীহ্ হিন্দুস্তান মেঁ

মূল ঃ হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী, মসীহ্ মাওউদ ইমাম মাহ্দী (আঃ)

(৭ম কিস্তি)

মোটকথা, ইঞ্জিলের উল্লেখিত শ্লোকটিতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়, মসীহ্ কবর থেকে বের হয়ে গ্যালীলের দিকে গেলেন। আর মার্কের ইঞ্জিলে লিখা আছে, 'তাঁকে কবর থেকে বেরিয়ে গ্যালীলের সড়ক দিয়ে যেতে দেখা গেল, আর পরিশেষে তিনি সেই এগার জন শিষ্যের সাথে মিলিত হলেন যারা তখন খাবার খাচ্ছিলো। তিনি তাদেরকে তাঁর ক্ষত-বিক্ষত হাত ও পা দেখালেন। তারা ধারণা করলো হয়তো এ কোন আত্মা হবে।' তিনি বললেন, 'আমাকে ছুঁয়ে দেখ। কেননা আত্মার দেহ ও হাড় থাকে না, অথচ আমাতে তোমরা দেহ ও হাড় দেখতে পাচ্ছ।' আর তিনি তাদের কাছ থেকে একটা ভাজা মাছের টুকরা ও এক চাক মধু নিলেন এবং তাদের সামনে তা খেলেন।"

(মার্ক ১৬ঃ১৪, লুক ২৪ঃ৩৯ এবং ৪০-৪২)।
* মথি ৯ঃ২৪; লুক ৮ঃ৫২ * মথি ১৬ঃ১৪ * লুক ২৪ঃ৩৯, ৪০-৪৩।

এ সকল আয়াত (বা শ্লোক) থেকে নিশ্চিৎ জানা যায়, হযরত মসীহ্ কখনও আকাশে যান নি, বরং কবর থেকে বের হয়ে গ্যালীলের দিকে যান এবং তিনি (তখন) স্বাভাবিক মানব দেহে ও সাধারণ কাপড়ে সাধারণ মানুষদের মতই ছিলেন। যদি তিনি মারা যাবার পর পুনরুত্থিত হতেন তাহলে তাঁর সেই জালালী (ঐশ্বরিক) দেহ ক্রুশবিদ্ধ হওয়ার ক্ষত চিহ্নগুলো কি ক'রে বহন করতে পারতো? আর রুটি খাওয়ার বা তাঁর কী প্রয়োজন ছিল? যদি খাওয়ার প্রয়োজন ছিল তাহলে এখনও সে প্রয়োজন বিদ্যমান।

পাঠকগণ যেন ধোঁকায় না পড়েন, ইহুদীদের সলীব বা ক্রুশ বুঝি এ যুগের ফাঁসির মত ছিল, যার থেকে জীবিতাবস্থায় উদ্ধার পাওয়া প্রায় অসম্ভব। কেননা, সেই যুগের ক্রুশে কোন দড়ি অপরাধীর গলায় জড়ানো হতো না এবং তাকে ফাঁসি কাষ্ঠ থেকে ফেলে দিয়ে ঝুলিয়ে দেয়াও হতো না। বরং ক্রুশ দিয়ে তার হাতে ও পায়ে পেরেক ঢুকিয়ে দেয়া হতো। তারপরও দু'এক দিন পর্যন্ত কাউকে রেহাই দেয়ার ইচ্ছা থাকলে সেটুকু শাস্তিই যথেষ্ট মনে করে তার হাড়গোড় চূর্ণ করার আগেই তাকে জীবিতাবস্থায় ক্রুশ থেকে নামিয়ে ফেলা হতো। আর মেরে ফেলাই যদি স্থির করা হতো তাহলে অন্তত তিন দিন পর্যন্ত ক্রুশবিদ্ধ অবস্থায় রেখে দেয়া হতো এবং পানি ও খাবার কোন কিছু তার কাছে পৌছতে দেয়া হতো না। সেভাবেই তাকে রোদে (খোলা আকাশের নীচে) তিন দিন বা তার চেয়েও বেশি পড়ে থাকতে ছেড়ে দেয়া হতো। এরপর তার হাড়গোড় ভেঙ্গে দেয়া হতো। এ যাবতীয় কষ্ট ও নির্যাতন ভোগ করার পর সে মারা যেতো। কিন্তু খোদাতাআলা তাঁর অপার অনুগ্রহে হযরত মসীহ্ (আঃ)-কে জীবনাবসান ঘটাতে পারে সে পর্যায়ের ক্লেশ ও যাতনা থেকে রক্ষা করলেন। একটু গভীর দৃষ্টিতে ইঞ্জিলগুলো পাঠ করলে আপনারা জানতে পারবেন, হযরত মসীহ্ (আঃ) তিন দিন ক্রুশে অবস্থান করেন নি। তিন দিনের ক্ষুধা ও পিপাসার কষ্টও তাঁকে ভোগ করতে হয় নি এবং তাঁর হাড়গোড়ও ভাঙ্গা হয় নি। বরং তিনি প্রায় দু'ঘন্টা মাত্র ক্রুশে অবস্থান করেন এবং খোদাতাআলার কৃপা ও অনুগ্রহে এমন উপক্রম হওয়ায় যে, দিনের শেষাংশে তাঁকে ক্রুশে দেয়ার সিদ্ধান্ত হয়। সে দিন শুক্রবার ছিল এবং দিনের মাত্র অল্প কিছু সময় বাকি ছিল। এর পরেই সাবাতের দিনের সূচনা ও ইহুদীদের 'ফাসাহ্' উৎসব ছিল। কাউকে সাবাত বা সাবাতের রাতে ক্রুশবিদ্ধ অবস্থায় রেখে দেয়া ইহুদীদের রীতি অনুযায়ী নিষিদ্ধ ও শাস্তিযোগ্য অপরাধ বলে গণ্য হতো। মুসলমানদের ন্যায় ইহুদীরাও চান্দ্র দিনপঞ্জী মেনে চলতো বলে সূর্যাস্তের পর মুহূর্ত থেকে পরবর্তী দিনের সূচনা হিসেবে ধরা হতো। অতএব একদিকে প্রকৃতিগত জাগতিক কারণে এ পরিস্থিতির উদ্ভব হলো। আর অন্য দিকে নৈসর্গিক স্বর্গীয় কারণে আল্লাহ্তাআলা আরেক পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটালেন, যখন ষষ্ঠ প্রহর, তখনই এমন এক তীব্র ধূলি-ঝড় উপস্থিত হলো যার ফলে তিন ঘন্টার জন্য সর্বত্র অন্ধকার ছেয়ে পড়লো (মার্ক ১৫ঃ৩৩)। এ ষষ্ঠ প্রহর ছিল বারটার পর অর্থাৎ সন্ধ্যা নেমে আসার কাছাকাছি সময়ে। তখন অন্ধকারের তীব্রতায় ইহুদীরা চিন্তায় পড়ে গেল, পাছে সাবাতের রাত শুরু হয়ে যায় বিধায় তারা সাবাতের পবিত্রতা ভঙ্গের অপরাধে অপরাধী সাব্যস্ত হয়ে পড়ে। সেজন্য তারা শীঘ্র মসীহ্কে ও তাঁর সাথী দু'জন চোরকেও ক্রুশ থেকে নামিয়ে দিল।

এর পাশাপাশি আরেকটি স্বর্গীয় কারণে এ পরিস্থিতির সৃষ্টি হলো যে, পিলাত যখন বিচারাসনে বসা ছিল তখন তার স্ত্রী তাকে বলে পাঠালেন, 'তুমি এ সত্যবাদীর ব্যাপারে মোটেও নাক গলাবে না (অর্থাৎ তাঁকে হত্যা করতে চেষ্টিত হবে না) কেননা আমি আজ রাতে স্বপ্নে অনেক কষ্ট পেয়েছি' (মথি ২৭ ঃ ১৯)। কাজেই পিলাতের স্ত্রীকে স্বপযোগে যে ফিরিশ্তা দেখানো হয়েছিল এতে আমরা তথা প্রত্যেক ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি মাত্রই নিশ্চিৎ অনুধাবন করবেন, মসীহ্ (আঃ) ক্রুশে মারা যান তা খোদা কখনও চান নি। দুনিয়ার সৃষ্টি কাল থেকে আজ অবধি খোদাতাআলা কোন ব্যক্তিকে বাঁচাবার জন্য স্বপ্নে কাউকে অনুপ্রেরণা দিলে তার ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রম কখনও ঘটে নি। যেমন, মথির ইঞ্জিলে লিখা আছে, প্রভুর এক ফিরিশ্তা স্বপ্নে ইউসুফের কাছে এসে বললো, উঠ! এ শিশু পুত্র ও এর মাকে সাথে নিয়ে মিশরে চলে যাও এবং সেখানে আমি তোমাকে সংবাদ না দেয়া পর্যন্ত অবস্থান কর, কেননা হেরড তাকে হত্যা করার জন্য খুঁজবে' (মথি ২ঃ১৩)। এ ক্ষেত্রে কি বলতে পারেন, যীশু মিশরে পৌছে মারা যেতে পারতেন? তেমনি খোদাতাআলার পক্ষ থেকে পিলাতের স্ত্রীকে স্বপ্ন দেখানোও ঐশী তদ্বিরের অংশ বিশেষ ছিল। আর এ তদ্বির ব্যর্থ হতে পারে তা কখনও সম্ভব ছিল না। মিশরে প্রবাসকালে মসীহ্র নিহত হওয়ার আশংকা করা যেমন আল্লাহ্তাআলার এক সুনির্দিষ্ট প্রতিশ্রুতির পরিপন্থী, ঠিক তেমনি এ স্থলেও খোদাতাআলার ফিরিশ্তাকে (স্বপ্নে) পিলাতের স্ত্রীর দেখতে পাওয়া, আর সেই সাথে মসীহ্ ক্রুশবিদ্ধ হয়ে মারা গেলে তা তাদের জন্য অমঙ্গলের কারণ হবে বলে ঐশী-নির্দেশনার দিকে ইঙ্গিত দেয়া সত্ত্বেও ফিরিশ্তার আত্মপ্রকাশ বৃথা যায় আর মসীহ্ ক্রুশে নিহত হন, এটা অকল্পনীয়। এর কি কোন নজির আছে? একটিও নেই। প্রত্যেক পুণ্যাত্মা মানুষের স্বচ্ছ বিবেক স্ত্রীর স্বপ্ন সম্বন্ধে অবহিত হয়ে এতে নিহিত এ সাক্ষ্যকে অনুভব না করে পারে না যে, প্রকৃতপক্ষে এ স্বপ্নের এক মাত্র লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ছিল, যেন হযরত মসীহ্কে উদ্ধার করার এক ভিত্তি স্থাপন করা হয়। অবশ্য দুনিয়াতে আকীদা-বিশ্বাসের প্রতি পক্ষপাতিত্বের জের টেনে একটি প্রকাশ্য সত্যকে অস্বীকার করার ও গ্রহণ না করার অধিকার প্রত্যেকেরই আছে। কিন্তু ন্যায়-বিচারের মাপকাঠিতে মানতেই হয়, পিলাতের স্ত্রীর স্বপ্নটি ক্রুশের মৃত্যু থেকে মসীহ্র রক্ষা পাওয়ার এক অতি বলিষ্ঠ সাক্ষ্য বিশেষ। আর এ সাক্ষ্যটি সবচেয়ে প্রথম পর্যায়ের ইঞ্জিল তথা মথি লিপিবদ্ধ করেছে। এ পুস্তকে আমি জোরালোভাবে যে সকল সাক্ষ্য প্রমাণ উপস্থাপন করবো যদিও সেগুলোতে যীশু মসীহ্র ঈশ্বর ও প্রায়শ্চিত্তবাদ সহসা বাতিল হয়ে যায়। তবুও ঈমানদারী, সততা ও সত্যের প্রতি ভালবাসা সর্বদা এটাই চায়, আমরা যেন সত্য গ্রহণে সাম্প্রদায়িক কুসংস্কার, পক্ষপাতিত্ব ও প্রথাগত বিশ্বাসকে অগ্রাহ্য করে বস্তুনিষ্ঠাকে অগ্রগণ্য করি। মানব সৃষ্টি অবধি আজও তার দৃষ্টির সংকীর্ণতা শত সহস্র বস্তুকে খোদা বানিয়ে বসেছে, এমন কি বিড়াল ও সাপেরও পূজা করা হয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও বুদ্ধিমান মানুষ খোদা-প্রদত্ত সুযোগ-সামর্থ্যে এ প্রকারের শিরক ও পৌত্তলিকতাপূর্ণ আকীদা-বিশ্বাসের কবল থেকে মুক্ত হয়ে এসেছে। (চলবে)

অনুবাদ ঃ মাওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ
মুরব্বী সিলসিলাহ্

বাংলা ভাষা-ভাষীদের সাথে হুযূর রাবে' (রাহেঃ)-এর সাক্ষাৎকার

(১৮-০২-০৩ তারিখে এম,টি,এ'র মাধ্যমে সরাসরি সম্প্রচারিত এবং অডিও ক্যাসেট থেকে সংকলিত। অনুবাদকের কাজ করেছেন মাওলানা ফিরোজ আলম সাহেব)

প্রথমে হুযূর (রাহেঃ) বাংলাদেশ জামাতের সালানা জলসার খবরা-খবর নেন মাওলানা ফিরোজ আলম সাহেবের কাছ থেকে। মাওলানা সাহেব হুযূর (রাহেঃ)-কে অনেকের সালাম পৌছালে হুযূর (রাহেঃ) **ওয়া আলায়কুমুস্ সালাম** বলে এর জবাব দেন।

প্রশ্ন নং ১ ঃ সূরা আল্ বাকারার ২৫০ নং আয়াতটি বুঝিয়ে বললে উপকৃত হব।

মাওলানা সাহেব আয়াতটি পাঠ করেন ও অনুবাদ করেন। এরপর প্রশ্নকারীকে জিজ্ঞেস করা হয় তিনি কী বুঝেন নি। প্রশ্নকারী পুরো ঘটনাটিই বুঝিয়ে বলতে বলেন।

হুযূর (রাহেঃ) উত্তর দেন ঃ আসলে হযরত দাউদের জাতির কথা বলা হয়েছে। যখন একটি নদী পার করে সেনাবাহিনী নিয়ে শত্রুর মোকাবিলা করতে যাচ্ছিলেন। আল্লাহ্তাআলা এ পানি পান না করার জন্যে আদেশ দিয়েছিলেন। কেবলমাত্র এক ঢোক পানি পান করতে বলেছিলেন। বেশি পানি পান করতে নিষেধ করেছিলেন। তাহলে তোমরা পরাজিত হবে। তাই বহুলোক অবাধ্যতা করলো আর পেট পুরে পানি পান করলো। কিছু লোক অবাধ্যতা করে নি। আর যখন তারা নদী পার হয়ে গেল তখন তারা এ দোয়া করলো। হে আল্লাহ্! **কাম্মিন ফিয়াতিন ক্বালীলাতিন গলাবাত ফিয়াতান কাছীরাতান** - তুমি জান, কত ছোট ছোট দল বড় বড় দলের ওপর জয়যুক্ত হয়েছে আল্লাহ্র আদেশে। সুতরাং আমাদেরকেও বিজয় দান কর। তাই যখন যুদ্ধ শুরু হলো তখন যারা অবাধ্যতা করেছিল তারা পলায়ন করলো আর যারা অল্পসংখ্যক ছিল তারা যুদ্ধ করতে থাকলো এবং শত্রুর ওপরে বিজয় লাভ করলো।

রব্বানা আফরিগ আলায়না সাবরাঁওয়া সাব্বিত আকদামানা ওয়ানসুরনা 'আলাল ক্বওমিল কাফিরীন - এটা একটা উত্তম দোয়া। এ দোয়াটা এমন পরিস্থিতিতে পাঠ করা আবশ্যক।

কৌতুক ঃ কোন এক ব্যক্তি চাকুরীর জন্যে ইন্টারভিউ দিতে গেছেন। তার নাম আব্দুল লতীফ। পিয়ন তাকে ডাকলো- আব্দুল লতীফ সাহেব আসেন। আসার সাথে সাথেই যে ইন্টারভিউ নিচ্ছিলেন তিনি বল্লেন, আপনার নাম কি? সে বল্লো, আপনি কি শুনেন নি যে, এখনই আমার নাম ধরে ডাকলো আর আমার নাম তো লেখাই আছে। লোকটি ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল। এত বড় বেয়াদব ছেলে! যাই হোক তিনি ধৈর্য ধরে বল্লেন, আপনার বাড়ী কোথায়? থানার সামনে। থানাটা কোথায়? সেটা তো বাড়ীর সামনে। তিনি রেগে গেলেন, বল্লেন, ও দুটো কোথায়? বল্লো, সে দুটো তো সামনা-সামনি। আপনি কি এটা বুঝেন না!

প্রশ্ন নং ২ ঃ সূরা আল্ বাকারার ৩৪ নং আয়াতে আল্লাহ্তাআলা বলছেন- তোমরা প্রকাশ কর বা গোপন কর আমি তা জানি। ফিরিশ্তারা আল্লাহ্র নির্দেশ ছাড়া কিছু গোপন বা প্রকাশ করতে পারেন কি, না কি এ ফিরিশ্তারা মানুষরূপী ফিরিশ্তা?

হুযূর (রাহেঃ) উত্তর দেন ঃ হুযূর (রাহেঃ) আয়াতটি পাঠ করতে বলেন। এর বাংলা অনুবাদ হলো- তিনি বললেন, 'হে আদম! তুমি তাদেরকে ওদের নাম বলে দাও; এরপর যখন সে তাদেরকে ওদের নাম বলে দিল, তিনি বললেন, আমি কি তোমাদেরকে বলি নি যে, নিশ্চয় আমি আকাশসমূহের ও পৃথিবীর গোপন বিষয়গুলো অবগত আছি আর যা তোমরা প্রকাশ কর ও যা তোমরা গোপন কর। আমি সবই জানি?'

এখানে **আম্বি'হুম বি আসমাইহিম** আদমকে সম্বোধন করে বলা হয়েছে। বলেছেন যে, তুমি তাদেরকে **আসমা** বা নামগুলো শিখাও। এ **আসমা** কি তা ফিরিশ্তার জানা ছিল না। **আসমা** শব্দের অর্থ হলো নাম বা গুণাবলী বা আল্লাহ্তাআলার সিফাত। আল্লাহ্তাআলার কিছু গুণাবলী এমন আছে যেমন **গফুরুর রহীম** অর্থাৎ পরম ক্ষমাশীল, বার বার কৃপাকারী। ফিরিশ্তারা তো পাপই করতে পারে না সুতরাং **গফুর** শব্দটি তাদের জানার কথা নয়। যারা পাপ করে না তাদের সাথে ক্ষমার সম্পর্ক হতে পারে না। তাই ফিরিশ্তারা বুঝে নি। এটিই হযরত আদম (আঃ) ফিরিশ্তাদের সামনে প্রকাশ করলেন। আর দ্বিতীয় দিক হলো **আম্বি'হুম বিআসমা-ইহিম** এর অর্থ পরবর্তীতে আদমের প্রজন্ম থেকে যেসব নবী জন্মগ্রহণ করবেন সে সমস্ত নবীদের নাম ফিরিশ্তাদের নিকট বর্ণনা করার জন্যে আদমকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। হযরত আদম সেগুলো বর্ণনা করলেন। ইতোপূর্বে আদমের প্রজন্ম থেকে নবীদের জন্মের ব্যাপারে যখন বলা হলো তখন তারা প্রশ্ন করেছিলেন, হে আল্লাহ্! পৃথিবীতে তুমি কি এমন কিছু সৃষ্টি করতে যাচ্ছ যারা রক্তারক্তি করবে। তখন এর উত্তরে বলা হয়েছে, যখন পৃথিবীতে নবীরা আগমন করবেন তখন রক্তারক্তি করবে নবীর বিরোধীরা। নবীরা এ রক্তপাত বন্ধ করতে আসবেন। তারা এ রক্তারক্তির জন্য দায়ী হবেন না।

কৌতুক ঃ ট্রেনে কুলীরা সাধারণতঃ জায়গা দখল করে রাখে যাত্রীদের কাছে বিক্রী করার জন্যে। এক কুলী একটা রুমাল দিয়ে সে জায়গা দখল করে রাখে। কিছুক্ষণ পরে এক মহিলা যাত্রী এসে রুমালটা সরিয়ে জায়গায় বসে যায়। কিছুক্ষণ পর ট্রেন ছাড়ার সময় হলে সেই কুলী এক যাত্রী নিয়ে এসে দেখে তার রুমাল সরিয়ে এক মহিলা বসে আছেন। সে বল্লো, এখানে তো আমি রুমাল রেখে গেছি আপনি কেন বসলেন? তখন সেখানে তর্ক-বিতর্ক আরম্ভ হলো। সে মহিলা খুব জোরে চিল্লিয়ে বল্ল, দেখুন ট্রেনে রুমাল রেখে বলছে জায়গাটা তার। আর ক'দিন বাদে ট্রেনের ওপর রুমাল রেখে বলবে ট্রেনটাই আমার! তখন পাশে যে যাত্রী বসা ছিল তিনি বল্লেন, বাহ্! আপনি তো ভাল চুপ করিয়ে দিলেন এ দালাল কুলীটাকে; কিন্তু

পাশে যে মহিলারা বক্ বক্ করছে তাদের আমরা কীভাবে চুপ করাতে পারি? সে মহিলা বল্ল, তাদেরকে গিয়ে বলুন Excuse me, আপনাদের মাঝে বয়স্ক মহিলা কে? তখন দেখবেন তারা চুপ হয়ে গেছে!

হুযুর (রাহেঃ) একটি কৌতুক বলেন ঃ

বাসে এক মহিলা একটি ছেলের পার্শ্বে বসে ছিলো। সেই ছেলের নাক থেকে ময়লা পড়ছিলো। সেই ছেলেটি শার্টের হাতা দিয়ে বার বার নাক পরিষ্কার করছিলো। ভদ্র মহিলা মনে হয় লজ্জা পেলেন আর বল্লেন, কী ব্যাপার তোমার কাছে কোন রুমাল নেই? সে বল্লো, রুমাল তো আছে কিন্তু দেব না। আপনিও আপনার হাতের আস্তিন দিয়ে নাক পরিষ্কার করুন!

আজই আমি চিঠি পেলাম। লিখেছেন, যখন থেকে আপনি এ কৌতুক শুরু করেছেন তখন থেকে এ অনুষ্ঠান খুবই আকর্ষণীয় হয়ে গিয়েছে। আর ছেলে-পেলেরা আগেও মজা পেত এখন তো আরও মজা পাচ্ছে।

আরও একটি কথা বলার ছিল। যখন কোন কাজ না থাকে আমি ক্রিকেট খেলা দেখে থাকি। বাংলা দেশ ও ওয়েস্টইন্ডিজের মাঝে খেলা হচ্ছিলো। ওয়েষ্টইন্ডিজ একটি নাম করা ক্রিকেট দল। বাংলাদেশের দলটি নতুন। কিন্তু বাংলাদেশ ওয়েষ্টইন্ডিজের সাথে সমান তালেই খেলে চলছিলো। কিন্তু বৃষ্টির কারণে খেলা বিঘ্নিত হয়। বাংলাদেশ তো হেরে যাওয়ার ছিলোই। বৃষ্টির বদৌলতে তারা ৩ পয়েন্ট পেয়ে গেছে।

প্রশ্ন নং ৩ ঃ হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রাঃ)-এর রাজনৈতিক দূরদর্শিতা সম্বন্ধে কিছু বলুন।

হুযূর (রাহেঃ) উত্তর দেন ঃ হুযূর (রাঃ)-এর দূরদর্শিতা খুবই প্রখর ছিলো। কাশ্মীরের ব্যাপারে তিনি মনে করেছিলেন যে, আমরা যদি পদক্ষেপ না নেই তাহলে কাশ্মীরের মহারাজা মুসলমানদের ধ্বংস করে দিবেন। তাই আল্লাহ্‌র ফযলে সময়মত আহমদী মোয়াল্লেমীন সেখানে পৌছেন আর তারা প্রচার করতে আরম্ভ করলেন। যে কাশ্মীরীরা ভীত হয়ে পড়েছিলো তারাও জেগে উঠলো। আর একটি শক্তিশালী প্রতিরোধ গড়ে উঠলো। ফল এ দাঁড়ালো যে, শেষ পর্যন্ত কাশ্মীরের মহারাজার সংশোধনী গ্রহণ করতে হ'ল- যার প্রস্তাব করা হয়েছিলো। আর মুসলমানরা তাদের অধিকার লাভ করলো। এটা একটি ঘটনা যা কাশ্মীরের ব্যাপারে হয়েছিলো।

দ্বিতীয়টি ছিলো শুদ্ধি আন্দোলন। মহারাজা ছিলেন হিন্দু। তার প্রভাব বেশি ছিলো। যারা মুসলমান ছিলো তারা এর আগে হিন্দু ছিলো। তাদের ভয় ছিলো তাদের না আবার দ্বিতীয় বার হিন্দু বানিয়ে নেয়। আর এ ব্যাপারে খুব জোর প্রচেষ্টা চলছিলো। হিন্দুরা অধিক সংখ্যায় মিলে মুসলমানদের হিন্দু বানাচ্ছিলো। সেই সময় হযরত মুসলেহ মাওউদ (রাঃ)-এর দৃষ্টি এ দিকে গেলো। তিনি (রাঃ) নিজের পক্ষ থেকে আহমদীদের বাহিনী পাঠালেন। তাদেরকে এ পরামর্শ দেয়া হয়েছিলো যে, তারা তাদের (মুসলমানদের) খাবার খাবে না। নিজেদের ব্যবস্থা নিজেরা করবে, নিজেরা খাবার পাক করে খাবে। তাদের খাবার খাবে না। তাদের ওপরে যেন চাপ না পড়ে। আর গিয়ে তাদেরকে বুঝাও ইসলাম হিন্দু ধর্মের চেয়ে কেন উৎকৃষ্ট। তাই এ আন্দোলনের প্রেক্ষিতে আহমদীয়া বিরাট কুরবানী পেশ করে। মার পিট খায়-ক্ষুধা সহ্য করে। শেষ পর্যন্ত সেই আন্দোলনের গতিকে বাধা দান করে। এর ফলে কেবল মুসলমানরাই পুনরায় মুসলমান হয় নি বরং হিন্দুরাও মুসলমান হতে শুরু করে। যখন এ পদক্ষেপ সফল হলো তখন চারিদিকে এর কথা ছড়িয়ে পড়লো। আর হিন্দুরা ভাইসরয়ের কাছে কনফারেন্স ডেকে এর সমাধানের জন্যে আবেদন করে। এ কনফারেন্স মৌলভী ইত্যাদির প্রভাব পড়ে। আর তারা বলে, যদি আহমদী শামেল হয় তাহলে আমরা যোগদান করবো না। অতএব গয়ের আহমদীদের ডাকা হয়। যখন আপসে আলাপ-আলোচনা হয় তখন হিন্দুরা বলে, তোমরা কারা আলোচনা করতে এসেছো? যাদের নিয়ে বিপদ তারা তো বাইরে বসে আছে। যতক্ষণ পর্যন্ত আহমদীরা এখানে না আসবে আমরা আলোচনা করতে রাজী নই। অতএব হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রাঃ)-কে তার-বার্তা প্রেরণ করা হয়। শীঘ্র আপনার প্রতিনিধি পাঠান। আহমদী প্রতিনিধি আসলে তখন পুনরায় আলোচনা আরম্ভ হয়।

এভাবে ইসরাঈলের ব্যাপারে এটা গঠনের পূর্বেই তাঁর যে দিক-নির্দেশনা ছিলো তা লক্ষ লক্ষ সংখ্যায় বিলি করা হয়। এতে হযরত মুসলেহ মাওউদ (রাঃ) ভবিষ্যতে যা কিছু হবে তা সব বর্ণনা করেন। তিনি তাদেরকে বিরত থাকতে বলেন। তোমরা লোভ করে অধিক পয়সায় তাদের নিকট জমি বিক্রী করছো। ইহুদীদের কাছে কিছুই ছিল না। যদি তোমরা বিরত না হও তাহলে এ জমিই তোমরা বিশগুণ দামে আবার কিনবে এবং তাদের কর্তৃত্ব তারা চারিদিকে ছড়িয়ে দেবে আর তোমাদের জমি তারা সব কব্জা করে নেবে। এমনই হয়েছে। সে সময় তারা কথা শুনে নি। অনেক আরবী লোক পত্র লিখেছে যে, আমরা হযরত মির্যা বশীর উদ্দীন মাহমুদ আহমদের কথা শুনলে এমনটি হতো না। আরও বহু ঘটনা রয়েছে যাতে তাঁর রাজনৈতিক দূরদর্শিতা দেখতে পাওয়া যায়।

খিলাফত আন্দোলনের কথা ধরা যাক। হিন্দুরা এ ব্যাপারে মুসলমানদেরকে পাগল করে তুলেছিল। তারা বললো, ইংরেজদের রাজত্ব ছেড়ে আফগানিস্তান চলে যাও। মুসলমানদের নিজেদের জায়গা-জমি বিক্রী করে অনেক মুসলমান আফগানিস্তান যায় আর সেখানে গিয়ে তারা মারা পড়ে। ক্ষুধা পিপাসায় তাদের আবার ফিরে আসতে হয়। আর সব কিছু ধ্বংস হয়ে যায়। আর তাদের সব কিছু হিন্দুরা কিনে নেয়। সেই সময় হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রাঃ) তাদেরকে দেশ ছাড়তে নিষেধ করেছিলেন। দেশ ছাড়লে অনেক ক্ষতির সম্মুখীন হবে। এ রকমই হয়েছে। একটি দু'টি নয় এ রকম বহু ঘটনা আছে। তিনি উম্মতে মুসলেমাকে যথাসময়ে সঠিক দিক-নির্দেশনা দিয়েছেন। যদি তারা এগুলো পালন করতো তাহলে অবস্থা অন্য রকম হতো।

কৌতুক ঃ একটি সমালোচকের কৌতুক। ভদ্রলোক যেখানেই খাওয়া-দাওয়া করতে যেত সেখানেই তার একটি মন্তব্য রাখতো বা খাবার সম্বন্ধে সমালোচনা করতো। কোনটা ঝাল বেশি হয়েছে, নুন বেশি হয়েছে ইত্যাদি। তার সাথের বন্ধু-বান্ধব ভাবলো যে, কি করে তার সমালোচনা বন্ধ করা যায়। তাকে একটা সবক দিতে হবে। তাই যখন একবার বন্ধু-বান্ধবের নিয়ে দাওয়াতে গেল। যাওয়ার আগে তারা পরামর্শ করলো যে, আমরা সেখানে এমনভাবে ব্যবস্থা করবো যে, সে আর সমালোচনা না করতে পারে। বাবুর্চি ডেকে ভালভাবে রান্না-বান্না করা হলো। কোন কিছুতেই যাতে অভাব না হয়

সে ব্যবস্থা নেয়া হলো। সেখানে খাওয়া - দাওয়ার সময় সে দেখলো খাবার খুবই ভাল হয়েছে। কোন ত্রুটি নেই। সবাই ভাবছে এখন আর সে কিছু বলতে পারবে না। খাওয়া-দাওয়ার পরে বন্ধু-বান্ধবরা বল্লো, বলো, এখন তোমার কি বলার আছে। সে আর কিছুই খুঁজে পায় না। তখন বল্লো, এত ভাল ভাল নয়!

প্রশ্ন নং ৪ ঃ মুসলেহ মাওউদ (রাঃ)-এর সংশোধনের এমন কি দিক আছে যেজন্যে তাকে মুসলেহ মাওউদ বলা হয়।

হুযূর (রাহেঃ) উত্তর দেন ঃ আমাদের যত অংগ-সংগঠন আছে এর সবই তিনি (রাঃ) গঠন করেছেন। খোদ্দামুল আহমদীয়া, লাজনা ইমাইল্লাহ্, আনসারুল্লাহ্ প্রভৃতি। আর এদের মাধ্যমে তিনি (রাঃ) ভবিষ্যত প্রজন্মের তরবিয়তের বিষয়কে সুনিশ্চিৎ করেছেন।

তাঁর মেধা কত তীক্ষ্ণ দেখুন। তিনি খোদ্দামদের মাঝে দুটি ভাগ রেখেছেন ও আনসারেও বিভক্তি করেছেন, কিন্তু লাজনাকে বিভক্ত করেন নি। যুবতী লাজনা আর বুড়ী লাজনা। কেননা তারা বয়স প্রকাশ করতে চায় না। এরকম করলে তাদের নিয়ে বিপদে পড়তে হতো। কেউ বুড়ী হতে চাইতো না।

একবার একটি সিনেমায় মেয়েরা তাদের মাথার হ্যাট খুলছে না। এতে পিছনের লোকদের দেখতে অসুবিধা হলো। অনেকবার ঘোষণা করা হলো, আপনারা হ্যাট খুলুন। আপনাদের পিছনে যারা রয়েছে তাদের দেখতে অসুবিধা হচ্ছে। কেউ হ্যাট খুলছে না। এরপর সিনেমার পক্ষ থেকে এক সতর্ক ব্যক্তি এ ঘোষণা করালেন যাদের বয়স ৩০ থেকে বেশি তারা হ্যাট পরতে পারেন। বাকী সবাই খুলে ফেলুন। এরপর সবাই হ্যাট খুলে ফেলেন। অর্থাৎ কেউই ৩০ এর বেশি বয়সী হতে চান নি।

প্রশ্ন নং ৫ ঃ ইসলামে সুপারিশ করার অনুমতি আছে কি বা এটা কি বৈধ?

হুযূর (রাহেঃ) উত্তর দেন ঃ রসূলুল্লাহ্ (সঃ) বলেছেন, যে নেক কাজে সুপারিশ করবে তার পুণ্য হবে আর যে ব্যক্তি তদনুযায়ী আমল করে সে-ও সওয়াব পাবে। আর যে মন্দ বা অবৈধ সুপারিশ করবে তার ওপরে পাপ বর্তাবে। তাই ভাল সুপারিশ করার অনুমতিই কেবল নেই বরং পসন্দনীয়।

কৌতুক ঃ একজন লোক ষ্টেশন মাষ্টারকে গিয়ে জিজ্ঞেস করছে অমুক ট্রেন ৬ আপ কখন যায়। সে বল্লো ৫-৪৫ মিঃ। আর একটা ট্রেন ৪ ডাউন সেটা কখন যায়। সে বল্লো, ৬.০০ মিঃ। এভাবে ৫/৬ টা ট্রেনের কথা জিজ্ঞেস করলে ষ্টেশন মাষ্টার রেগে গিয়ে বলেন, আপনি কোথায় যাবেন? আমি কোথাও যাব না। কেবল রেল লাইনটা ক্রস করবো!

প্রশ্ন নং ৬ ঃ মুসলেহ্ মাওউদ দিবস সম্বন্ধে কিছু বলুন।

হুযূর (রাহেঃ) উত্তর দেন ঃ তিনি যেসব পুণ্যকর্ম জারী করেছিলেন সেগুলো স্মরণ করা হয় এ দিনে। হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রাঃ)-এর যিকরে খায়ের চলতে থাকে। মানুষের ভিতর প্রেরণা সৃষ্টি হয় যাতে তাঁর জন্যে দোয়া করা হয়।

প্রশ্ন নং ৭ ঃ কোন স্থানে একাকী একটি আহমদী পরিবার থাকলে তারা ঈদের নামায পড়তে পারে কিনা।

হুযূর (রাহেঃ) উত্তর দেন ঃ অন্য কোন পরিবার না থাকলে পড়তে পারে। আঁ হুযূর (সঃ) একবার এক ব্যক্তিকে, যে জঙ্গলে ছাগল চড়াতো তার কথা- আপনি তো জামাতে নামায পড়তে বলেন, আমি তো সেখান থেকে মসজিদে আসতে পারি না সেক্ষেত্রে আমার বাজামাত নামায কীভাবে হবে- এর প্রেক্ষিতে হুযূর (সঃ) বলেন, তুমি আযান দাও। কোন পথিক শুনলে তোমার সাথে এসে যোগ দেবে তখন জামাত হয়ে যাবে। আর কেউ যদি না আসে তাহলে ফিরিশ্তা তোমার সাথে যোগ দেবে। এভাবে তোমার বাজামাত নামায বিবেচিত হবে। এভাবে একাকী কোন পরিবারও বাজামাত নামায পড়তে পারে।

প্রশ্ন নং ৮ ঃ হাদীস শরীফে জানা যায়, এক ব্যক্তি তার সন্তানদেরকে বলছিলো, আমার মৃত্যুর পর আমার লাশ জ্বালিয়ে সমুদ্রে ফেলে দিও যেন আল্লাহ্ আমাকে শাস্তি দিতে না পারেন। তার মৃত্যুর পর আল্লাহ্তাআলা তাকে প্রশ্ন করলেন, তুমি এ কাজটি করতে নির্দেশ দিয়েছো কেন? এ প্রশ্নটি কি কিয়ামত দিবসে হবে না ইতিমধ্যে হয়ে গেছে?

হুযূর (রাহেঃ) উত্তর দেন ঃ এ ধরনের ঘটনা কিয়ামতের দিন হবে।

প্রশ্ন নং ৯ ঃ সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও যারা কুরবানী দেয় না তাদের কি পাপ হবে?

হুযূর (রাহেঃ) উত্তর দেন ঃ সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও যারা কুরবানী দিবেন না তাদের পাপ হবে। এটা এজন্যে যে, কুরআন করীমের বহু স্থানে আর্থিক কুরবানীর কথা বলা হয়েছে। এমন কি এ-ও বলা হয়েছে যে, আর্থিক কুরবানী করে তারা জান্নাত ক্রয় করে নিয়েছে। যে কুরবানী করে না তাকে বুঝানো আবশ্যক। তুমি পাপ করছো।

এ পর্যায়ে মাওলানা ফিরোজ আলম সাহেব বলেন, প্রশ্নকারী ঈদুল আযহিয়ার কুরবানীর কথা বলছেন। এরপর হুযূর (রাহেঃ) বলেন, এ ব্যাপারে চিন্তা করার কোন কারণ নেই। হুযূর (সঃ) এক বার কুরবানী দিয়ে বললেন, এ কুরবানী আমার পক্ষ থেকে, আমার পরিবারের পক্ষ থেকে আর আমার উম্মতের সেসব লোকদের পক্ষ থেকে যারা সামর্থ্য রাখে না। গরীবদের তো এতে খুশী হওয়ার কথা।

প্রশ্ন নং ১০ ঃ কোন কোন শিশু বাম হাতে কাজ করে তাদের প্রতি কি শক্তি প্রয়োগ করা আবশ্যক?

হুযূর (রাহেঃ) উত্তর দেন ঃ এটা ব্যতিক্রম। তারা নিঃসন্দেহে বাম হাতে কাজ করতে পারে।

প্রশ্ন নং ১১ ঃ বিয়ের আগে ছেলে ও মেয়ে যখন পরস্পরকে দেখে তখন ইসলাম তাদেরকে কতটা স্বাধীনতা দেয়?

হুযূর (রাহেঃ) উত্তর দেন ঃ এ সম্বন্ধে সমীচীন এটাই যে, মা-বাবার সাথে একই টেবিলে খাবার খেয়ে নেয়। সেখানেই কথা-বার্তা বলে। আলাদাভাবে সাক্ষাৎ করা ঠিক নয়।

প্রশ্ন নং ১২ ঃ ফযলে উমর অর্থ কী?

হুযূর (রাহেঃ) উত্তর দেন ঃ ফযলে উমরের অর্থ তো হলো যার বয়স বাড়িয়ে দেয়া হয়।

প্রশ্ন নং ১৩ ঃ হাতের পাঁচটা আঙ্গুল সমান নয় কেন?

হুযূর (রাহেঃ) উত্তর দেন ঃ এর কোন উত্তর নেই। আল্লাহ্তাআলা এভাবেই বানিয়েছেন যেন ছোট বড় চেনা যায়।

সংকলন ও অনুবাদ - **নূরুদ্দীন আমজাদ খান চৌধুরী**

সমগ্র বিশ্বের উপর হযরত রহমাতুল্লিল আলামীন (সঃ)-এর আশীষ ও কল্যাণ

মূল ঃ হযরত মির্যা বশীর উদ্দীন মাহ্‌মুদ আহমদ, খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রাঃ)

(৮ম কিস্তি)

পঙ্গু ও প্রতিবন্ধিদের জন্য রহমত

তারপর আমার দৃষ্টি পড়ল প্রতিবন্ধি মানুষের উপর। আমি দেখলাম, অনেক মানুষ কোন না কোন কারণে ব্যর্থ এবং অকর্মণ্য হয়ে আছে। তাঁদের অনেকে অন্ধ, অনেকে বধির, অনেকে বোবা, আবার অনেকে ন্যাংড়া এবং পঙ্গু। অনেকে পক্ষাঘাতগ্রস্থ। অনেকে শারীরিকভাবে খুবই রোগাক্রান্ত। অনেকে বৃদ্ধ অথবা অনেক ছোট, অনাথ ও অযোগ্য-অক্ষম এবং অন্যকে অসহায় নিরুপায়, সহায়-সম্বলহীন। আমি দেখলাম, এ ধরনের মানুষ- বড়ই আশ্চর্যজনক সৃষ্টি। আমি দেখলাম, অনেকে বিকলাঙ্গ হওয়া সত্ত্বেও তাদের অন্তর দুষ্টামীতে পরিপূর্ণ। কারো হাত নেই, তবুও সে পায়ের সাহায্যেও চুরির চেষ্টায় রত থাকে। আবার পা না থাকা সত্ত্বেও ছেঁচড়িয়ে ছেঁচড়িয়ে নিজেকে অপরাধের স্থানে নিয়ে যেতে চেষ্টা করছে। চোখ নেই কিন্তু কানের সাহায্যেই সে কুদৃষ্টির অপরাধে অপরাধী হচ্ছে। অথবা হাত দিয়ে স্পর্শ করেও মন্দ অভিপ্রায় চরিতার্থ করার চেষ্টা করছে। যারা সহায়-সম্বলহীন তাদের দেখলাম। তাদের চেহারায় রাজা-বাদশাহ্‌দের মতই আত্মম্ভরিতার অভ্যাস সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ পাচ্ছে। যারা বড় নিরুপায় তাদের দেখলাম, তারা তাদের এমন অবস্থা নিয়েও অন্যকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেয়ার চেষ্টা করছে। আবার এদের মাঝে এমনও অনেককে দেখলাম, যাদের হৃদয় আল্লাহ্‌র নূরে আলোকিত উদ্ভাসিত ছিল। তাদের বাহ্যিক দৃষ্টিশক্তি যদিও ছিল না কিন্তু তারা চক্ষুষ্মানদের চেয়েও প্রখর অন্তর্দৃষ্টির অধিকারী। যাদের শারীরিক শ্রবণশক্তি অর্থাৎ কান ছিল না কিন্তু তারা অত্যন্ত প্রবল আধ্যাত্মিক শ্রবণশক্তির মালিক। বাহ্যিক হাত ছিল না কিন্তু যেসব পুণ্যকর্মকে তারা ধরেন তা আর ছাড়েন না। পা ছিল না কিন্তু পুণ্যের পথে তারা অগ্রগামী ছিলেন যেমন কোন দ্রুতগামী ঘোড়া দৌড়ায়। কিন্তু তাদের অপারগতার কারণে তারা এত কিছু করতে পারে না যতটা তাদের করার ইচ্ছা ছিল এবং অন্য স্বচ্ছল-সুস্থ-সবলরা করতে পারে। ফলে সবাই মনে করে যে, এরা তো অচল ও অপদার্থ। আমি দেখেছি তাদের হাত না থাকার ততটা ব্যথা ছিল না যতটা ব্যথা ছিল তাদের সেসব পুণ্যকর্ম সম্পাদনের অপারগতার যেসব কাজে হাতের প্রয়োজন হয়। তাদের দৃষ্টি শক্তি না থাকার ব্যথা ততটা তারা মনে করত না যতটা তারা সেসব পুণ্যকর্ম সম্পাদনের ক্ষমতা না থাকায় ব্যথাবোধ করত যেসব কাজে চোখের প্রয়োজন হয়। মোটকথা এই যে, তাদের যার যে অঙ্গটি ছিল না বা যে অঙ্গটি না থাকার অভাব ছিল সেটির জন্য সে ততটা মনে কষ্ট নিত না কিন্তু সেটির অভাবে যেসব পুণ্যকর্ম তারা করতে পারত না এর জন্য অনেক কষ্টবোধ করত। আমি তাদেরকে হাজারো অসুন্দর হওয়া সত্ত্বেও অতি সুন্দর দেখলাম এবং তাদের হাজারো অক্ষমতা সত্ত্বেও তাদেরকে বড় সক্ষম ও সবল পেলাম। আমি অত্যন্ত উচ্চ কণ্ঠে বলে উঠলাম, বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের মাঝে অসংখ্য মতভেদ থাকা সত্ত্বেও এতে কারো দ্বিমত বা মতভেদ হবে যে, এরা আল্লাহ্‌র বড় সুন্দর সৃষ্টি। তাদের যে স্বল্পতা বা অভাব তা (পঙ্গুত্ব) তার সামনে হাজারো পূর্ণতাকে বিসর্জন দেয়া যায়। এদের দ্বারা প্রমাণ হচ্ছে যে, আল্লাহ্ যদি কৃপা করেন, অনুগ্রহ করেন তবে আবর্জনার ঢেরের ওপরও পরিষ্কার সুন্দর সবুজ চারা, গাছ-গাছালি জন্মাতে পারে।

কিন্তু আমি অতি আশ্চর্য হয়ে গেলাম এই দেখে যে, একদল লোক এ ব্যাপারে আমার সাথে মতোবিরোধ পোষণ করে। তাদের অনেকে বলল, 'আপনি এমন সব অপবিত্র লোকদেরকে ভাল বলছেন? অথচ এদের সাথে দূরত্ব বজায় রেখে চলার আদেশ দেয়া হয়েছে। এদের সাথে বসে একসাথে খাবার খাওয়াও জায়েয নয়। এদেরকে স্পর্শ করাও জায়েয নয়'। আর একদল বলল, 'এরা তো এদের অতীতের অপকর্মের ফল ভোগ করছে! এরা কি করে আল্লাহ্‌র প্রিয় হয়ে গেল?' তারা তো এদের অতীতের পাপ পর্যন্ত বলতে শুরু করে দিল যে, কোন পাপের কারণে এদের চোখ নষ্ট হয়েছে। অমুক ককুর্মের ফলে এদের কান নষ্ট হয়েছে। কিন্তু লোক হেসে হেসে বলল, এ সব তো ঠাট্টা-মস্করার কথা। আসল কথা হলো, এদের ওপরে তো এমন সব প্রেতাত্মারা ভর করেছে যাদেরকে আমাদের খোদাবন্দ বহিষ্কার করতেন। তারপর তাঁর শিষ্যরা বহিষ্কার করতেন। কিন্তু বর্তমান যুগে এমন মহামানব নেই। আমি বললাম, ইয়া আল্লাহ্! পৃথিবীর মানুষের কী হয়ে গেল? এরা অন্তর্দৃষ্টিশূন্য, এরা চোখবিহীনদের ওপর হাসছে; এরা নিজেরা হৃদয়ের কান শূন্য এরা বাহ্যিক যাদের কান নেই তাদেরকে নিয়ে হাসছে। এরা বেশি বিশ্রী ও কুৎসিত! এরা ওসব বিকলাঙ্গদের অন্তরের রূপ-গুণের সৌন্দর্যের মূল্য কী বুঝবে? যাদের হৃদয় তোমার নূরের আলোয় ঝলমল করছে। এদের বক্ষদেশ তোমার ভালবাসার ফলে ভরে গেছে, চমৎকার ফুল বাগান হয়ে গেছে। উহ্! আমি কি করে বিশ্বাস করতে পারি, হে আল্লাহ্, যে তুমিও এসব চক্ষুষ্মানদের মত কার থলিতে কি আছে তা তো দেখ, কিন্তু কার অন্তরে কি আছে তা দেখ না? ইত্যবসরে আমার চিন্তা ও কল্পনার তরঙ্গকে সেই আওয়াজ থামিয়ে দিল, যে আওয়াজ পূর্বেও সকল ক্ষেত্রে সমস্যার সমাধান ও দিক-নির্দেশনা দিয়েছে। সেই আওয়াজ বড় উন্নত ও সুন্দর হয়ে উচ্চারিত ও উত্থিত হলো, সেই আওয়াজ এত চমৎকার ও মনমোহিনী ছিল যে, কারো প্রিয়তম কোনদিন এত সুন্দর ছিল না। এত উজ্জ্বলতা ও মর্যাদাবান সে (যার আওয়াজ বার বার শুনি) যে কোন বাদশাহ্ স্বপ্নেও এত বড় মর্যাদাবান হতে পারে না। সে বল্লো, হে যারা সৎকর্ম করে যাচ্ছ! হে যারা আল্লাহ্‌র পথে জান-প্রাণ কুরবানী দিচ্ছ! তোমরা একথা ভেব না যে, কেবল তোমরাই আল্লাহ্‌র প্রিয় পাত্র এবং আল্লাহ্‌র পুরস্কার কেবল তোমাদেরই প্রাপ্য! স্মরণ রাখবে, তোমাদের আরো কিছু ভাই আছে যারা তোমাদের মত এত বড়, এত চমৎকার পুণ্যকর্ম করছে না, উত্তম কাজের মাঠে তারা নামতে পারছে না। যা তোমরা করছ। তারা এত কঠিন কাজে শামেল হতে পারছে না। কিন্তু তবুও তারা তোমাদের সাথেই আছে, তোমাদের মতই পুণ্যের অংশীদার। তারাও আল্লাহ্‌র প্রিয়জনদের মাঝে শরীক আছে।

এবার দেখলাম, পুণ্যবানদের উপত্যকার মাঝে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। তারা চিৎকার করছে, কেন, কেন এমন হবে? সেই পবিত্র কণ্ঠ, সেই আওয়াজ বললো, এজন্য এমন যে, তাদের হাত পা নেই, বিকলাঙ্গ হবার কারণে তোমাদের সাথে পুণ্যকর্মে বাহ্যিকভাবে তাদেরকে শামেল দেখছ না। কিন্তু তাদের আত্মা, তাদের হৃদয় তোমাদের সাথে আছে। তোমরা যখন পুণ্যকর্ম সম্পাদন করে আনন্দবোধ কর তখন তারা অন্তরে অন্তরে বিদগ্ধ হয়। দুঃখ এবং পুণ্যে শামেল হতে না পারার ব্যথায় জর্জরিত হয়। বড় তিক্ত ঢোক গিলতে থাকে। যদিও শরবত ভিন্ন ভিন্ন নিঃসন্দেহে এ শরাব (শরাবানতহুরা) ভিন্ন রকম। কিন্তু এর মান পৃথক নয়। ফলাফল একই। তোমরা পায়ে হেঁটে যে স্থানে পৌছ তারা সে স্থানে তাদের হৃদয়ের পাখায় উড়ে পৌছেছে। এদের নাপাক বলবে না। এদের মাঝে যারা পুণ্যবান তারা তোমাদের চেয়ে পবিত্রতার দিক থেকে কম নয়। আমার রূহ্ আনন্দে আত্মহারা হয়ে গেল। আমি বিভোর হয়ে গেলাম। আমার আত্মা নাচতে শুরু করল! আমি বললাম, "সাদ্‌দাকতা ইয়া রসূলাল্লাহ্। হে রসূলুল্লাহ্। তুমি সত্য বলেছ!" এরই নাম তো, ন্যায়-বিচার! আমার অন্তর থেকে আবার এক দীর্ঘ নিঃশ্বাস বেরিয়ে আসল, আমি বললাম, 'শক্তিশালীদের পক্ষে তো সবই থাকে, কিন্তু এ মহান কণ্ঠস্বর তো বিকলাঙ্গ, পঙ্গুদের জন্যও রহমত প্রমাণিত হয়েছে'! (চলবে)

অনুবাদ - মাওলানা মুহাম্মদ ইমদাদুর রহমান সিদ্দিকী
মুরব্বী সিলসিলাহ্

ঐশীবাণী, যুক্তিবাদিতা, জ্ঞান এবং সত্য

মূল ঃ হযরত মির্যা তাহের আহমদ, খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (রাহেঃ)

পর্ব ২ ঃ অধ্যায় ঃ ৬

কষ্ট ও যন্ত্রণাভোগ প্রসঙ্গে

আমরা যখন বিবর্তনবাদের ইতিহাস বুঝতে চেষ্টা করি তখন দেখতে পাই, বিবর্তন তত্ত্বের মূল কথা হচ্ছে ক্রমাগত পালটাবার একটি প্রক্রিয়া যা শুরু থেকেই ক্ষয় ও প্রাপ্তির (Loss and gain) চেতনার মাঝ দিয়ে এগিয়ে চলেছে। এভাবেই যখন আমাদের বাহ্যিক ইন্দ্রিয় বা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের জন্ম হলো, তখন ধীরে ধীরে এ চেতনারও ক্রম-বিকাশ ঘটতে থাকলো। আদিম থেকে আধুনিক মানব আকৃতিতে পরিণত হওয়ার এ ধারা মূলত নিম্ন পর্যায়ের জীব থেকে যাত্রা করে যেমন চিন্তা করার গুণ ও ক্ষমতাসম্পন্ন মানুষে পরিণত হওয়া, তেমনি ক্ষীণ-আনন্দ বেদনার চেতনা থেকে পূর্ণ চেতনায় উত্তরণ ঘটা। এদিক থেকে বিবর্তন হচ্ছে প্রকৃত প্রস্তাবে মানুষের চিন্তা ও চেতনার বিবর্তন (In real terms, the evolution is the evolution of consciousness)।

তবে মানুষ-হিসাবে গড়ে ওঠার আদিকালে ক্ষয় ও প্রাপ্তির এই চেতনা যে অনেকটা অস্পষ্ট ও অস্বচ্ছ ছিল (Rather vague and obscure) তা বলাই বাহুল্য। তবে সেই সময়ে ও প্রাথমিক পর্যায়ের যে অবয়ব ছিল (Rudimentary organisms), তা পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও পরিবেশের সাথে প্রতিক্রিয়া সম্পন্ন করতো। এতে মনে হয় যে সৃষ্টিকর্তা তাদের মাঝেও পারিপার্শ্বিক অবস্থা সম্পর্কে অবহিত হওয়ার একটা ক্ষমতা সৃষ্টি করে দিয়েছিলেন, যার সঠিক প্রকৃতি ব্যাখ্যা করা আজ সাধ্য নয়। পরিবেশকে উপলব্ধি করার এই ক্ষমতাই ক্রম উন্নতির মাধ্যমে বিকশিত হয়ে মানুষের ইন্দ্রিয় নিয়ে বা চেতনা শক্তি (Sensory organs) হিসাবে রূপ লাভ করেছে। মানুষের চেতনাকে কেন্দ্রীয়ভাবে নিয়ন্ত্রণ করার একটি অঙ্গ-হিসেবে সৃষ্টির এই পর্যায়ে মস্তিষ্কের সাহায্যে মানুষ চিন্তা করার গুণ ও সিদ্ধান্ত নেবার ক্ষমতা অর্জন করে। এই যে ক্ষমতা সেদিক থেকে মানুষ সমস্ত জীব জগতের মধ্যে এগিয়ে রয়েছে। অন্য কোন প্রাণীর এ ধরনের চেতনাসমৃদ্ধ ও দীপ্তিমান অবস্থান নেই। তাই

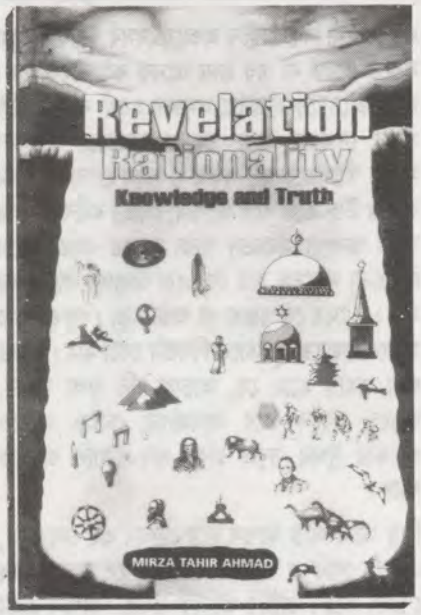

দুঃখ-কষ্টের অনুভূতি ও সেসব প্রাণীর মাঝে তুলনামূলকভাবে অনেক কম। আসলে সুখ-দুঃখের অনুভূতি মানুষের মাঝে তাই অন্য প্রাণীদের তুলনায় অনেক বেশি, যেহেতু তাদের মনন ও চেতনা অন্যান্য সৃষ্টির চেয়ে অনেক উন্নত।

উপলব্ধি ও আস্বাদনের এ ভিন্নতাকে মাথায় রেখেই দুঃখ-কষ্ট ভোগ বা সুখ-আনন্দের বিষয়টি ব্যাখ্যা করা দরকার। আমাদের মনে রাখতে হবে যে, দুঃখ-ভোগের মাত্রা যদি কোনভাবে কমানো যায় (If the level to which suffering can be experienced is reduced) তাহলে ঠিক একই মাত্রায় এর বিপরীত মেরুতে অবস্থানরত সুখ ও আনন্দ অনুভূতির ক্ষমতা ও কমে আসে (The capacity of feel pleasure and happiness will also be lowered to the same degree)। তাই, সুখ-দুঃখের এ চেতনা বিবর্তনের চাকাকে (wheel of evolution) গতিময় করার ক্ষেত্রে সমান গুরুত্বপূর্ণ। এদের উভয়ের অবস্থান এরূপ যে, একটিকে ছাড়া অপরটি অচল, আর বিবর্তনের চিরায়ত পরিকল্পনা পরস্পরের ভারসাম্য অবস্থানের কেবল কার্যকর হতে পারে।

পবিত্র কুরআন থেকে জানা যায় যে, সৃষ্টিকর্তা যন্ত্রণা বা দুঃখকে আলাদা কোন সত্তা থেকে সৃষ্টি করেন নি, বরং একে এর বিপরীত মেরুর অবস্থান অর্জন না করার কারণে (অর্থাৎ আনন্দ ও সুখ বঞ্চিত) সাময়িক এক সৃষ্ট অবস্থা বলে অভিহিত করেছেন। এদিক থেকে সুখের অনুপস্থিতিই দুঃখ (The absence of happiness is suffering) যেমনি আলোর অনুপস্থিতি ছায়া বা অন্ধকারের সৃষ্টি। যে কথাটা আমাদের স্বীকার করতে হবে তা হ'ল, জীব মাত্রেরই মৃত্যু আছে (If there is life, there has to be death)। এ দু'টো বিষয় অর্থাৎ জীবন ও মৃত্যু একই সমতলের দুই দূরতর প্রান্তে অবস্থান করে (Both are situated at the extreme poles of the same plane)। যখন আমরা মৃত্যুকে পেছনে ফেলে সামনে এগিয়ে যাই (As we move away from death)।

তখন আমরা ধীরে ধীরে এমন এক অবস্থার নিকটবর্তী হই, যার নাম সুখ। ঠিক একইভাবে যখন আমরা জীবন থেকে দূরে সরে যাই, তখনই আমরা এক প্রকার দুঃখ ও যন্ত্রণাকে অনুভব করি, যার শেষ পরিণতি হচ্ছে মৃত্যু (We move away with a sense of loss and sorrow towards death)। বেঁচে থাকার সংগ্রাম (Stuggle for existence) তত্ত্বকে বোঝার জন্য এটা হচ্ছে বুনিয়াদী বিষয়। এর পরিণতিতেই অন্যায় থেকে ন্যায়ের পথ অনুসরণ করে, আমাদের জীবনের মানকে ক্রমাগত পরিশীলিত করার এই যে প্রচেষ্টা, তাই ব্যক্তি বা জাতীয় জীবনে স্থায়ী অগ্রগতির ভিত্তি রচনা করে। বিবর্তনবাদ তত্ত্বের এ হচ্ছে প্রকৃত লক্ষ্য (Ultimate goal of evolution), আর যোগ্যতমের বেঁচে থাকা (Survival of the fitest) নীতিমালার এ হচ্ছে গোড়ার কথা।

পবিত্র কুরআনের সূরা মূল্‌কের ২ ও ৩ নং আয়াতে এ বিষয়টিকেই সুন্দরভাবে তুলে ধরা হয়েছে। যেমন, "পরম আশীষ ও কল্যাণময় তিনি, যার হাতে সকল আধিপত্য এবং তিনিই সবকিছুর ওপর সর্বশক্তিমান। যিনি মৃত্যু এবং জীবনকে সৃষ্টি করেছেন, যেন মানুষের মাঝে কাজ-কর্মে কে উত্তম, তা পরীক্ষা করেন, এবং তিনিই মহাপরাক্রান্ত ও অতি ক্ষমাশীল।" কেন এ পৃথিবীতে আমরা যন্ত্রণা বা দুঃখ ভোগকারী

অথবা মৃত্যুর সাথে জীবনের কি সম্পর্ক? এ জাতীয় প্রশ্নের সার্বজনীন একটি উত্তর পবিত্র কুরআনের উপরোক্ত আয়াতে অতি সুন্দরভাবে প্রতিফলিত হয়েছে।

জীবন ও মৃত্যু সম্পর্কে আমরা এ অভিমত পোষণ করি যে, জীবন হচ্ছে ইতিবাচক মূল্যবোধসমূহের ক্রমাগত ঔৎকর্ষ ও বিকাশ সাধনের এক নিরবচ্ছিন্ন প্রক্রিয়া, আর এর অনুপস্থিতিই হচ্ছে মৃত্যু (death merely means its absence)। আমাদের মতে এ দু'টো বিষয়ের মাঝে স্পষ্ট কোন সীমারেখা নেই (No sharp border exists separating one from the other)। এটা আমাদের কর্মের মাঝে আবর্তিত হয়। বিবেক, যুক্তি ও নৈতিক চেতনার পরশে যেমন আমরা জীবনের পথে এগিয়ে চলি, ঠিক তেমনি এসব শক্তি অর্জনে যখন ভাটা পড়ে, তখন আমরা মৃত্যুর পথে পা রাখি। প্রশ্ন করা যেতে পারে খোদা কেন এই নীতি-নির্ধারণ করলেন? 'যেন মানুষের মাঝে কাজ-কর্মে কে উত্তম তা পরীক্ষা করে দেখেন' - পবিত্র কুরআন যার উত্তর অতি সুন্দরভাবে তুলে ধরেছে (সূরা মূলক ঃ ৩)।

বিবর্তনবাদ সংক্রান্ত আলোচনায় পবিত্র কুরআনের উপরোক্ত শিক্ষাকে আমরা মূল দর্শন হিসেবে বিবেচনা করতে পারি। বস্তুত, জীবন ও মরণের শক্তির এই যে নিরন্তর লড়াই ও এর পরিণতিকে খেয়াল রেখেই আমাদের সিদ্ধান্ত নিতে হবে যে, আমরা কি মৃত্যু থেকে দূরে থাকবো, না তার দিকেই এগুবো।? বিবর্তনবাদের এটাই হচ্ছে সার কথা ও অন্তর্নিহিত শক্তি (This is the essence and spirit of evolution)।

এবারে দুঃখ-যন্ত্রণা ও কষ্টভোগের ব্যাপারে দু'একটি প্রশ্নের উত্তর খোঁজা যাক। দুঃখকে তখনই আমরা আপত্তিকর বিষয় হিসেবে বিবেচনা করতে পারি যখন একে আলাদা অস্তিত্ব হিসেবে, অথবা আমাদের সার্বিক জীবনাচরণে এর কোন ভূমিকা নেই বলে আমরা মনে করবো। কিন্তু আমরা কি ভেবে দেখেছি যে, যদি দুঃখের কোন অনুভূতি বা যন্ত্রণার কোন উপলব্ধি না থাকে (Without the taste of suffering or an awareness of what it means), তাহলে এক নিমিষেই সুখ বা আরামের চেতনাও আমাদের কাছ থেকে দূরে সরে পড়ে (Joy and happiness lose all meaning)। দু'টো বিষয়েই এমন অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত যে, এর কোনটাকে অস্বীকার করে জীবন বা বিবর্তনবাদের বিভিন্ন ধাপকে হৃদয়ঙ্গম করা একটি বাস্তবতা বর্জিত ধারণা মাত্র।

তাই, আমাদের পঞ্চ-ইন্দ্রিয়ের বিবর্তন বা প্রাপ্তি ও ক্ষতির অবহিতি, জগত ও জীবন সম্পর্কে সঠিক উপলব্ধির জন্যই একান্ত প্রয়োজন। সুখ-দুঃখের বিষয়টি যেন একটি দ্বি-চক্র বিশিষ্ট গাড়ীর মত (Two wheels of a wagon), এর একটিকে বাদ দিলে অপরটিও অচল হয়ে পড়বে। জীবন মৃত্যুর এ চিরায়ত সংগ্রামে সুখ-দুঃখ একটি নির্দিষ্ট প্রক্রিয়া বা শৃঙ্খলেরই অংশ বিশেষ। সামাজিক অগ্রগতির প্রক্রিয়ায় এ উভয় বিষয় মানুষের প্রেরণা, আবেগ ও বুনিয়াদী প্রেরণার উৎস (Primar motivating force) হিসেবে ক্রিয়াশীল।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, বিবর্তনবাদের সুদূরপ্রসারী ইতিহাসে আনন্দ-বেদনা, সুখ-দুঃখ ইত্যাদি জীবনের আবশ্যিক অংশ মাত্র। এমন কি বিভিন্ন রোগ ব্যাধি, যা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে অন্য বহু কারণ হতে উদ্ভূত তা-ও সামাজিক পরিবর্তনের সাথে সম্পর্কযুক্ত। আর তাই পরিবেশগত পরিবর্তন, অস্তিত্বের জন্য সংগ্রাম, জীবকোষের হঠাৎ পরিবর্তন (Mutation), এমনকি হঠাৎ দুর্ঘটনা - এসবই সামাজিক অগ্রগতিতে ভূমিকা পালন করে চলেছে। বিভিন্ন জীব মাত্রই অনেকটা অবচেতন অবস্থা থেকে এ রূপান্তরের দিকে এগিয়ে চলেছে (Appears to follow a consiously designed course towards greater consciousness)।

এবারে আমরা একটি অনুসিদ্ধান্ত (Hypothetical) অনুসরণ করে এ বিষয়টি ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করতে পারি। যদি ধরে নেয়া যায় যে, এখন থেকে সকল প্রকার জীবকে একই যন্ত্রণায় আনন্দ বা সুখের জোগান দেয়া হবে, এবং কাউকেই কোন প্রকার কষ্ট দেয়া হবে না, তাহলে অনিবার্যভাবে যে প্রশ্নটি সামনে এসে দেখা দিবে তা হলো ঃ কীভাবে এবং কোথা থেকে এ নূতন কর্মসূচী শুরু হবে? (How and where should we introduce this new scheme?)। আর যেখান থেকেই শুরু হোক্ না কেন, কারো জীবনের (যেমন মাছ মাংস খেতে গেলে পশুর জীবন হানি, ফল-মূল খেতে গেলে গাছের অঙ্গ হানি ইত্যাদি) ক্ষয়-ক্ষতি বা দুঃখ-বেদনা ছাড়া এ নূতন স্কীম (New scheme!) কার্যকর করা কিছুতেই সম্ভবপর নয়। ফলে এ নূতন রীতি হয় জীব-সৃষ্টির শুরুতে নয়ত কখনই নয় বলে বিবেচিত হবে। বস্তুত, কাউকে দুঃখ না দিয়ে সার্বজনীন সাম্য (Absolute equality) স্থাপন এক অবাস্তব কল্পনা। বিবর্তন তত্ত্বের শুরুর ধাপেও যদি আবার ফিরে যাওয়া যায়, তাহলে এ নূতন-রীতি নিয়ে এক পা-ও আগানো যাবে না। কেননা, কোন প্রকার দুঃখ বা বেদনা ছাড়া নির্ভেজাল সুখ লাভ করার ধারণা বিবর্তন তত্ত্বকেই নিশ্চিত ধ্বংসের মুখে ফেলে দিবে (Total absence of suffering would entirely eleminate the impetus for evolution)। বেঁচে থাকার সংগ্রাম, প্রাকৃতিক নির্বাচন, বা যোগ্যতমের বেঁচে থাকা কোনটারই চর্চা করা সম্ভবপর হবে না। (There would be no struggle for existence no natural selection, no survival of the fittest)।

আধুনিক বিজ্ঞান মানব-জীবনের বিকাশের ক্ষেত্রে যে উল্লেযোগ্য ৩টি স্তরের ব্যাখ্যা করেছে- এর মাঝে ১. নিউক্লিয়াস সহ ব্যাকটেরিয়া, ২. নিউক্লিয়াসহীন ব্যাকটেরিয়া এবং ৩. পাইরো ব্যাকটেরিয়ার (যা আগুনের শক্তিতে সৃষ্ট) মাঝ দিয়ে অতিক্রম করার কথা বলেছে। এ নূতন কাল্পনিক রীতি অনুযায়ী এগুলো সবই অকার্যকর হয়ে পড়বে, কেননা, সবাইকে সমান খাদ্য সরবরাহ করা হচ্ছে, এবং এজন্য তাদের মাঝে খাদ্য নিয়ে বা বাঁচার জন্যে এর কোন প্রতিযোগিতা নেই (There would be no competition for food or survival)। এর ফলশ্রুতিতে জীবনের গতি স্থির ও প্রাথমিক পর্যায়েই রয়ে যাবে। মানুষের উদ্ভব হওয়া তো সুদূর পরাহত (The creation of man would remain a far cry)। এ প্রেক্ষাপটে আমরা এমন একটা কাল্পনিক রীতিকে মেনে নিব কি নেব না (To be or not to be) এ প্রশ্ন করা হলে সেই প্রাথমিক পর্যায়ের জীব যদি তাদের চিন্তা করার মত কোন মস্তিষ্ক থাকে (If they had a brain to think),তাহলে অবশ্যই বলে উঠবে ঃ না এমন অর্থহীন অবাস্তব তন্ত্রকে চাই না। (Not to be in such meaningless drudgry)।

শাস্তি প্রসঙ্গে আরেকটি বিষয় উল্লেখের দাবী রাখে, আর তাহলো প্রতিশোধপ্রবণতা (Idea of retribution)। কিছু কিছু প্রাণী সহ (হাতি, মহিষ) মানুষের মাঝে প্রতিশোধের স্পৃহা বিদ্যমান। তবে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে পশুদের বেলায় এটা প্রবৃত্তিজনিত (Intuitive), কিন্তু মানুষের বেলায় এটা চিন্তা-ভাবনার মাঝ দিয়ে কাজ করে (Calculated decision of mind)। আর এমন ক্ষেত্রে পরিকল্পনা গ্রহণের ক্ষমতা যেহেতু মানুষের হাতে, তাই তাকেই সিদ্ধান্ত নিতে হবে সে কি একাজের মাঝ দিয়ে আলোর দিকে যাবে, না অন্ধকারের দিকে। জীবনের দিকে নাকি মৃত্যুর দিকে? (Whether one moves towards light or darkness, towards life or death?)।

একজন ব্যক্তি যে নিজ অপকর্ম বা দোষেও অনেক সময় কষ্ট পেতে পারে তা প্রায়শই অনুধাবন করে না। প্রকৃতির যে বিধান, সেগুলোকে অমান্য করলে প্রকৃতিই একদিন তার প্রতিশোধ নেয়। প্রচলিত বিশ্বাস অনুযায়ী একেই নেমেসিস (Nemesis) বা অন্যায়ের প্রতিশোধ বা অনিবার্য ফল হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। এ দুঃখ ভোগের কারণ কোন কোন ক্ষেত্রে হয়তো তার নিজের কর্ম-ফল, আবার কোন কোন ক্ষেত্রে এর কার্য-কারণ সম্পর্ক চিহ্নিত করা কঠিন। কোন কাজের প্রতিফলন তাৎক্ষণিক, আবার কোন কাজের শাস্তি অনেক ধীর গতিতে বাস্তবে রূপ নেয়, যেন প্রকৃতিই নিজ হাতে এর প্রতিশোধ নিয়ে নিল। (Nature executes justice against transgression)।

যেহেতু বিষয়টি খুবই জটিল এবং সুদূর প্রসারী, কিছু বৈজ্ঞানিক দৃষ্টান্ত সহকারে এ ধারণার আরো ব্যাখ্যা করা দরকার। কোন কোন শিশু জন্মগত অনেক ত্রুটি বা বৈকল্য সহকারে জন্ম নেয়। এর কারণ কী? এটার জন্য তো তাদেরকে দায়ী করা যায় না। কোন ত্রুটি যদি থেকেই থাকে, তাহলে এটা তো তাদের পিতা-মাতার এবং যা অবশ্যই অনিচ্ছাকৃত (That may not have been intentional on their part)।

সে যাই হোক্ এটা নিশ্চিত যে, সেই মাসুম শিশু বাচ্চা তার এ বিকলাঙ্গতার জন্য দায়ী নয়। তাই, আমাদের সকল দুঃখ যেমন শাস্তিজনিত নয়, তেমনি সকল আনন্দও কোন কাজের পুরস্কার হিসেবে নয়। এটা পৃথিবীর কর্মযজ্ঞে অন্যসব বিষয়ের সাথে অন্তর্ভুক্ত এগুলো বর্জিত অংশ (By product of the wide plan of creator)। মাত্র, যা মানব সমাজের সার্বিক অগ্রগতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে।

আরেকটি কথা, কার্য-কারণ সম্পর্ক এবং পাপ ও শাস্তি আলাদা বিষয়। আমাদের প্রাত্যহিক জীবন-পরিক্রমায় সুখ ও দুঃখ একটি স্বাভাবিক ঘটনা। এগুলো শাস্তিজনিত কোন বিষয় নয়। তবে হ্যাঁ, দুঃখ-কষ্ট আমাদের জীবনের এক মহান শিক্ষক হিসাবে বিবেচনার দাবী রাখে। যেহেতু এগুলো আমাদের আচার- আচরণকে সংশোধন করে, আমাদেরকে বিনয়ী করে এবং পরিণামে আল্লাহ্‌র দিকে আমাদেরকে ধাবিত করে। এর জন্যে আল্লাহ্‌কে অভিযুক্ত করা বোকামী। কষ্ট তো আমাদের জন্য ছদ্মবেশে আশীর্বাদস্বরূপ (Suffering is .. indeed a blessing in disguise)।

আধুনিক এ পৃথিবীর দিকে তাকালে কী দেখা যাবে? এর বেশির ভাগ বৈজ্ঞানিক গবেষণা আমাদের কষ্ট ও যন্ত্রণার উপশম ঘটনার লক্ষ্যেই কাজ করে যাচ্ছে। এর বেশির ভাগের লক্ষ্য হচ্ছে কষ্টের লাঘব করা, এর মাধ্যমে বিলাসিতা অর্জন কিন্তু ততটা নয় (Is based less on a desire at gain luxuries than on a need to escape pain)।

স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে যে, মহান আল্লাহ্‌র অপার মহিমা ও পরিকল্পনা অনুযায়ীই সৃষ্টির মাঝে আপাত এ বৈষম্য। যে নবজাতক আজ বিকলাঙ্গ হিসাবে জন্ম নিল, বা কোন কঠিন অসুখের পার্শ্ব প্রতিক্রিয়ায় অন্ধ বা বধির হয়ে গেল এটা তার কোন দোষের জন্য নয়। সে বরং একজন নির্দোষ শাস্তি ভোগকারী (Innocent sufferer)। অবাস্তব যুক্তি মেনে নিয়ে স্রষ্টা যদি সকল শিশুকে সুস্থ বা সকল শিশুকে অসুস্থ করে সৃষ্টি করতেন। তাহলে আজকে সৃষ্টির মাঝে যে বৈচিত্র্য ও এর ফলে যে সচলতা, তা থেমে যেত। আর একথাও ভুলে গেলে চলবে না যে, শিশুর স্বাস্থ্যের বিষয়টিও একটি আপেক্ষিত বা তুলনামূলক ঘটনা (The death of a baby itself is merely of relative value)। এমন কোন দু'টি শিশু খুঁজে বের করা কঠিন হবে, যাদের স্বাস্থ্য, মন-মানসিকতা, হৃদয় ও বুদ্ধিবৃত্তি একই মানের। তাহলে এটা কি স্রষ্টার কোন পক্ষপাতিত্ব যে তিনি কাউকে অন্য থেকে ভাল বা শক্তিসম্পন্ন করে সৃষ্টি করেছেন? আমাদের আবেগকে যুক্তির সাথে গুলিয়ে ফেলা ঠিক হবে না। আমরা যদি বস্তুনিষ্ঠ পর্যালোচনা করি তাহলে দেখা যাবে যে, আমাদের কেউ কেউ বুদ্ধিবৃত্তি বা হৃদয়বৃত্তির দিক থেকে অন্যদের চেয়ে অগ্রগামী। এটা না হয়ে সবাই একই মানের হলে কী হতো? সৃষ্টি এক ঘেঁয়েমিতে ভরে যেত, এ একঘেঁয়েমি থেকে মুক্তির জন্যই স্রষ্টাকে বৈচিত্র্যের সৃষ্টি করতে হয়েছে (To create variety and diversity to break the montony)। আর যেখানে এ ভিন্নতা রয়েছে, সেখানে অবশ্যম্ভাবীরূপে আপেক্ষিক সুখ ও দুঃখের অবস্থানও থাকবে। (Wherever there is variety and diversity, comparative suffering and happiness are bound to be generated)। কেউ এ বৈষম্যকে যদি একদম দূরীভূত করার জন্য অযুত বর্ষ সময় ব্যাপী প্রচেষ্টাও চালায়, কিন্তু খোদার এ অনুপম ধারার বিপরীতে কোন অপেক্ষাকৃত গ্রহণযোগ্য সমাধান বের করতে পারবে না। (চলবে)

সংক্ষিপ্ত ভাবানুবাদ - **অধ্যাপক মোঃ আমীর হোসেন**

সংশোধনী

পাক্ষিক আহমদীর ৩০ শে জুন, ২০০৩ সংখ্যার "ঐশীবাণী, যুক্তিবাদিতা, জ্ঞান এবং সত্য" শীর্ষক অনুবাদ অংশের ১৩ পৃষ্ঠার ১ম কলামে ২০ লাইনের 'গাছ কাটার করাতের (See-saw) মত কখনও বা বিজিত 'অংশের স্থলে 'খেলনা ঢেঁকির (See -saw) অনুরূপ সুখ-দুঃখের এ সংগ্রাম অবস্থানগত পরিবর্তন ঘটিয়ে চলেছে, কখনও ভাল বা কখনও আলোর অনুকূলে আবার কখনও বা মন্দ বা অন্ধকারের অনুকূলে" পাঠ করতে হবে। অনুবাদক পুনরায় চিন্তা করে এভাবে অনুবাদ করেছেন। পাঠক-পাঠিকাদের এ অসুবিধার কারণে আমরা দুঃখিত।

- নির্বাহী সম্পাদক

যুক্তরাজ্য জামাতের ৩৭তম সালানা জলসার প্রতিবেদন

মোট বয়াত, ৮ লক্ষ ৯২ হজার ৪০৩ জন। মোট উপস্থিতি ৮১টি দেশের ২৫,০০০-এরও বেশি হয়েছে।

আল্লাহ্‌তাআলার বিশেষ ফযল ও রহমতে যুক্তরাজ্যের ৩৭তম সালানা জলসা বিরাট সাফল্যের সাথে সমাপ্ত হয়েছে। এ জলসার সংক্ষিপ্ত রিপোর্ট আমাদের সম্মানিত 'আহমদী' পাঠকগণের খেদমতে পেশ করছি।

২৫ জুলাই শুক্রবার বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা ৬.০০টায় সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরুর আহমদ, খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আইঃ) ইসলামাবাদ জলসাগাহে জুমুআর খুতবা দিয়েছেন এবং জুমুআর নামায আদায় করেছেন। জুমুআর খুতবায় হযরত সাহেব (আইঃ) প্রথমে আহমদীয়া জামাতের জলসার উদ্দেশ্য সম্পর্কে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর লেখা থেকে কয়েকটি উদ্ধৃতি পড়ে শোনান। হযরত মসীহ্ মওউদ (আঃ) বলেছেন, আমাদের জামাতের জলসা জাগতিক মেলা, খেলাধূলার মত নয়। আমাদের জলসার উদ্দেশ্য অত্যন্ত পবিত্র। উপস্থিত হওয়ার উদ্দেশ্য, কুরআন হাদীসের জ্ঞান ইসলামী শিক্ষা সম্বলিত জ্ঞান-গর্ভ মূল্যবান বক্তৃতা শ্রবণ। কারণ ঈমান ও আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য আধ্যাত্মিক জ্ঞান অর্জন আবশ্যক। তাছাড়া বিশেষভাবে সবাই মিলে দোয়া করার একটি সুবর্ণ সুযোগ গ্রহণ। তারপর এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ উদেশ্য যে, প্রতিবছর যারা নতুন বয়াত করে জামাতে প্রবেশ করেন তাদের সাথে পরিচিত হওয়া। পরস্পরের সাথে ভ্রাতৃত্ব বন্ধন দৃঢ় করা। এভাবে প্রতিবছর বার বার সাক্ষাতের ফলে ভ্রাতৃত্ব বন্ধন দৃঢ়তর হতে থাকে। এ রকম আরো অনেক জামাতি ও রূহানী উপকার ও কল্যাণ রয়েছে যা আস্তে আস্তে প্রকাশ পাবে।

সুতরাং বিভিন্ন প্রকার কষ্ট স্বীকার করে হলেও প্রত্যেকর উচিত জলসায় এসে শামেল হওয়া। ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক জীবনের জন্য এতটুকু কষ্ট সানন্দে স্বীকার করা উচিত।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) আরো বলেছেন, আমাদের আগমনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে মানুষ এখনও অনেক কিছু জানে না। প্রতি বছর জলসায় আপনারা যদি উৎসাহ ও উদ্দীপনা নিয়ে অংশগ্রহণ করেন তাহলে আমাদের আগমনের উদ্দেশ্য সফল হবে। অনেকে মনে করেন যে, জলসায় বেশি বেশি মানুষ অংশগ্রহণ করলে হযরত সাহেবের কষ্ট হবে। জামাতের অনেক টাকা ব্যয় হবে। এমন মনে করা জায়েয নয় বরং হযরত (আঃ) বলেছেন, এমন ধারণা করা শির্ক। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলেছেন, জলসায় শামেল হওয়ার জন্য প্রত্যেকের সচেষ্ট হওয়া উচিত। কারণ এখানে হযরত সাহেবের সাথে সাক্ষাৎ ও সাহচর্য লাভ হয়। আল্লাহ্‌র মনোনীত, আল্লাহ্-প্রেরিত বুযুর্গ ইমামের সাথে যত বেশি সাক্ষাৎ এবং যত বেশি সময় তাঁর নিকটে থাকার সুযোগ হয় ততই আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভ হয়। রূহানী তা'লীম তরবিয়ত লাভের সুযোগ হয়। প্রকৃত অর্থে তা'লীম-তরবিয়ত হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-এর সাহচর্য লাভ।

তারপর হযরত আমীরুল মু'মিনীন (আইঃ) হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর কতিপয় ইলহাম পড়ে শোনান। এ সমস্ত ইলহামের সারমর্ম এই যে, আল্লাহ্ শীঘ্রই আহমদীয়তের বিজয় দান করবেন। কিন্তু বহু বিপদাপদ আসবে। কুরবানী দিতে হবে। যেমন ঃ "আল্লাহ্ বলেছেন, "(আরবীর অনুবাদ) আমি আমার সৈন্যবাহিনীসহ তোমার কাছে আস্‌ছি। আল্লাহ্ কি তার বান্দার জন্য যথেষ্ট নন? হে পাহাড়সমূহ! তোমরা মাথা নত কর! হে পক্ষিকূল তোমরাও।"

২৫ জুলাই, শুক্রবার বাংলাদেশ সময় রাত ৯.০০ টায় হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস ৩৭তম সালানা জলসা ইউ কে-এর উদ্বোধনের জন্য জলসাগাহে আগমন করেন। হযরত (আইঃ) সাহেবের সাথে, মোহতরম আমীর সাহেব ইউ কে, ইমাম আতাউল মুজীব রাশেদ সাহেব, প্রাইভেট সেক্রেটারী জনাব মুনির আহমদ জাভেদ সাহেব ছিলেন। হযরত আমীরুল মু'মিনীন (আইঃ) প্রথমে আহমদীয়া মুসলিম জামাতের গৌরবোজ্জ্বল পতাকা উত্তোলন অনুষ্ঠানে পতাকা উত্তোলন করেন। হযরত সাহেবের সাথে সাথে আমীর সাহেব ইউ কে ইংল্যান্ডের পতাকা উত্তোলন করেন। তারপর হুযূর (আইঃ) দোয়া পরিচালনা করেন। পরে হুযূর (আইঃ) জলসাগাহে চমৎকার ষ্টেজের উপর এসে নির্ধারিত আসন গ্রহণ করেন। তখন জলসাগাহের হাজার হাজার আহমদী উৎসাহভরে 'নারায়ে তকবীর ধ্বনি দিতে থাকেন।

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আইঃ) জলসার উদ্বোধনী ভাষণে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর জলসা সালানা ১৮৯৭ইং সনের উদ্বোধনী ভাষণের কতিপয় উদ্ধৃতি পাঠ করে শোনান যার মূল বিষয় ছিল 'তাকওয়াহ্'। কিন্তু মূল বক্তব্যে যাবার পূর্বে হুযূর (আইঃ) হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর একটি নির্দেশ পড়ে শোনান। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) তাঁর নির্দেশে বলেছেন, "তোমাদের উচিত বক্তৃতাসমূহ খুব মনোযোগ নিয়ে শ্রবণ করা। কারণ এগুলো ঈমানের বিষয়। ... "

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ (আইঃ) প্রায় দেড় ঘন্টার বেশি সময় নিয়ে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর বক্তৃতার অনেক অংশ পড়ে শুনিয়েছেন। অতি সংক্ষেপে কয়েকটি কথা এখানে উল্লেখ করছি। আল্লাহ্‌তাআলা বলেছেন ঃ "নিশ্চয় আল্লাহ্ তাদের সঙ্গে আছে যারা তাকওয়াহ্ অবলম্বন করে এবং যারা সৎকর্মশীল (১৬ঃ১২১)।

আমাদের জামাতের লোকদের বিশেষভাবে তাকওয়াহ্ অবলম্বন করা উচিত। কারণ তারা এ যুগের আল্লাহ্ প্রেরিত ইমামের অনুসারী। অতএব অন্যদের সামনে তাদের উত্তম নমুনা দেখানো উচিত। তাছাড়া যারা তাকওয়াহ্ অবলম্বন করে আল্লাহ্ তাদের সকল সমস্যার সমাধান করেন। আল্লাহ্ স্বয়ং তাদের হেফাযত করেন। আল্লাহ্ বলেছেন "... যে তাকওয়াহ্ অবলম্বন করে, আল্লাহ্ তার জন্য কোন না কোন উপায় বের করেন। এবং তিনি তাকে এমনভাবে রিয্‌ক দান করেন যা সে কল্পনাও করতে পারে না। ..." (সূরা ত্বলাক; ৬৫ঃ৩-৪)।

আবার আল্লাহ্ একথাও বলেছেন "মুত্তাকীরাই কেবল আল্লাহ্‌র বন্ধু হন।" (৮ঃ৩৫) হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলেছেন, এ জগতে যদি কোন বাদশাহ্ বা কোন ক্ষমতাশালী ব্যক্তি কারো বন্ধু হয় তাহলে সে কী করে? সেক্ষেত্রে আল্লাহ্ যিনি সর্বাধিপতি তিনি যদি কারো বন্ধু হন তাহলে তার কি কোন চিন্তা থাকে? এভাবে অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহীভাবে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর বক্তব্যের বিশেষ অংশ হুযূর (আইঃ) এ জলসার উদ্বোধনী ভাষণে তুলে ধরেন। আমাদের ভাইদের এ ভাষণের বাংলা ধারা বিবরণী শ্রবণ করা অবশ্যই উচিত। ঈমান ও শান্তির জন্য আমাদের একটু কষ্ট স্বীকার করা কি উচিত নয়? হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর বাণী অমৃত সুধা। মৃত সঞ্জীবনী সুধা। হুযূর (আইঃ)-এর কালাম (বাণী) পড়লে বা শুনলে রূহানী জীবন লাভ হয়।

২৬শে জুলাই শনিবার প্রথম অধিবেশন বা সকালের অধিবেশন সভাপতিত্ব করেন মোহতরম চৌধুরী হামিদ উলাহ্ সাহেব উকিলে আ'লা, তাহ্‌রীকে জাদীদ, পাকিস্তান। তেলাওয়াত ও নযমের পর মৌলানা লাঈক আহমদ তাহের, মুরব্বী ইংল্যান্ড এবং মওলানা আতাউল মুজীব রাশেদ, ইমাম মসজিদ ফযল লন্ডন মূল্যবান বক্তব্য পেশ করেন।

বিভিন্ন অধিবেশনের ফাঁকে ফাঁকে ইংল্যান্ড ও অন্যান্য দেশের রাষ্ট্র প্রধানগণের বিশেষ পয়গায় তাঁদের বিশেষ প্রতিনিধিরা পড়ে শোনান।

তারপর এ অধিবেশনের শেষ পর্যায়ে হযরত আমীরুল মু'মিনীন সৈয়্যদনা মির্যা মসরূর আহমদ সাহেব, খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আইঃ) লাজনা ইমাইল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ প্রদান করেন। হুযূর (আইঃ) তাঁর এ বক্তৃতায় তরবিয়তে আওলাদ তথা নতুন প্রজন্মের আধ্যাত্মিক শিক্ষা ও প্রশিক্ষার ক্ষেত্রে মায়েদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা বলেছেন। হুযূর (আইঃ)-এর ভাষণ অত্যন্ত আবেদনময় ও আকর্ষণ সৃষ্টিকারী ভাষণ ছিল।

২৬শে জুলাই বাদ দুপুর একটি বিশেষ অধিবেশনে মোহতরম রফিক আহমদ হায়াত, আমীর ই.কে. সভাপতিত্ব করেন। এ অধিবেশনে কয়েকজন ইংল্যান্ডের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ বক্তৃতা করেন। তাদের মাঝে মিঃ টনি কোলম্যান, পাটনী এলাকা থেকে বর্তমান সরকারী দলের সংসদ সদস্য বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী মিঃ টনি ব্লেয়ারের প্রতিনিধি হিসেবে এসেছিলেন এবং মাননীয় প্রধান মন্ত্রীর বিশেষ শুভেচ্ছা বাণী পড়ে শোনান। প্রত্যেক অধিবেশনে দু'জন করে বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় প্রতিনিধিরা বক্তব্য রেখেছেন। তারা সবাই বিশ্বব্যাপী আহমদীয়া জামাতের বিভিন্ন কর্মকান্ডের প্রশংসা করেছেন। আল্‌হামদুলিল্লাহ্।

দ্বিতীয় দিনের বিকালের সবচেয়ে আকর্ষণীয় বিশেষ অধিবেশনে হযরত আমীরুল মু'মিনীন খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আইঃ) তাঁর বিশেষ বক্তব্য পেশ করেন। এখানে হুযূর (আইঃ) দু'ঘন্টার বেশি সময় নিয়ে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে আহমদীয়তের উন্নতি ও অগ্রগতির একটি সংক্ষিপ্ত রূপরেখা জগদ্বাসীর সামনে তুলে ধরেন।

এবছর আরো তিনটি দেশে আহমদীয়তের প্রবেশ ঘটেছে। ১৯৮৪ইং থেকে এযাবত মোট ৮৫টি দেশে আহমদীয়তের বিস্তার ঘটল, আলহামদুলিল্লাহ্।

এবারের নতুন তিনটি দেশ যেখানে আহমদীয়তের প্রবেশ ঘটেছে- তা হ'ল- কিউবা, মার্টিনী এবং পেরু।

এবার বিভিন্ন দেশে মোট ৫১৮টি নতুন জামাত কায়েম হয়েছে এবং ৪৫২টি নতুন স্থানে কয়েকজন করে আহমদী হয়েছেন। কিন্তু এখনও জামাত প্রতিষ্ঠা করা হয় নি। সবচেয়ে বেশি নতুন জামাত হয়েছে ভারতে। ২২০টি নতুন জামাত ভারতে, ৭৬টি নতুন জামাত কেনিয়া, বুরকিনাফাসু-তে ৪৪টি, কংগো-তে ৪০টি, নাইজেরীয়া-তে ২৪; আইভরীকোস্টে ২২, ঘানাতে ১৩; সেনেগালে ১২টি নতুন জামাত কায়েম হয়েছে এবং অন্যান্য দেশে কিছু কিছু নতুন জামাত কায়েম হয়েছে। গ্যাম্বীয়াতে ৩৯টি নতুন জামাত হয়েছে, আল্‌হামদুলিল্লাহ্।

এ বছর আল্লাহ্‌র ফযলে মোট ২২৬টি নতুন মসজিদ হয়েছে। এর মাঝে ১২১টি নতুন নির্মাণ হয়েছে এবং ১০৫টি মসজিদ পূর্ব নির্মিত পাওয়া গেছে। কারণ এসব মসজিদের নামাযীগণ তাদের ইমামগণসহ আহমদীয়তে প্রবেশ করেছেন। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (রাহেঃ)-এর হিজরতের পরে গত ১৯ বছরে এ যাবত মোট ১৩,২৯১টি মসজিদ হয়েছে আমাদের বিভিন্ন দেশে। এর মাঝে ১১,৪৭২টি মসজিদ এভাবে পাওয়া গেছে যে, সেই মসজিদের নামাযীগণ তাদের ইমামসহ পুরো গ্রামসহ আহমদী হয়ে গেছেন, আল্ হামদুলিল্লাহ্।

এবার মর্ডেন (লন্ডন) এ 'বায়তুল ফুতূহ্' অনেক বড় মসজিদের নির্মাণ কাজ প্রায় শেষ। এ রকম আরো অনেক মসজিদ নির্মিত হয়েছে। অনেক জায়গায় মসজিদের জন্য জমি ক্রয় করা হয়েছে। বাংলাদেশেও ১১টি স্থানে মসজিদের জায়গাহ্ নেয়া হয়েছে। ইন্দোনেশিয়ায় একটি বড় কেন্দ্র স্থাপনের জন্য প্রায় ৭৫ একর জমির একটি প্লট ক্রয় করা হয়েছে। পৃথিবীর সকল দেশে সালানা জলসার জন্য বড় বড় জায়গার প্রয়োজন হচ্ছে। ইংল্যান্ডের ইসলামাবাদ যেখানে এখন জলসা হচ্ছে তা ছোট হয়ে গেছে। আগামীতে ইসলামাবাদের প্রায় ৭৫ একর এলাকায় জলসাগাহে জলসা হবে, ইনশাআল্লাহ্।

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের একশ'র বেশি ভাষায় জামাতের বই-পত্র প্রকাশ হয়েছে। দিন দিন প্রকাশনার বিষয়টি ব্যাপকতা লাভ করে চলেছে। এবার প্রথমবার কাতলান ভাষায় কুরআন শরীফের অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে। এটি স্পেন দেশীয় একটি ভাষা। অনেক ভাষায় কুরআনের অনুবাদ পুণর্মুদ্রিত হয়েছে। এযাবত মোট ৫৭টি ভাষায় সম্পূর্ণ কুরআনের অনুবাদ ছেপে গেছে। ২৫টি ভাষায় অনুবাদের কাজ শেষ হয়েছে- প্রেসে বিভিন্ন অবস্থায় রয়েছে। শীঘ্রই প্রকাশিত হয়ে যাবে। আরো কয়েকটি ভাষায় অনুবাদের কাজ চলছে।

ইসলামী নীতিদর্শন (ইসলামী উসুল কি ফিলসফি) হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ ৫৩ ভাষায় ছেপে গেছে। আরো ৪ ভাষায় অনুবাদ হচ্ছে। ১৮টি ভাষায় ১৩৯টি বই ছাপার কাজ চলছে। আমি আজকের এই সুযোগে আপনাদের কাছে আবেদন করছি- যারা ইংরেজী ভাষা ভাল জানেন তারা নিজেদের নাম পেশ করেন। জামাতের কলমের জেহাদে অংশগ্রহণ করুন। জামাতের প্রয়োজন অনেক বেশি। স্পেনীয় ভাষায় কুরআনের অনুবাদের পুনর্মুদ্রণ প্রকাশ হয়েছে।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর মলফূযাতের বইসমূহ ১০ খন্ডে ছাপা হয়েছিল। এবার এসবগুলোকে ৫ খন্ডে এনে ছাপা হয়েছে। Jecess in India. মসীহ্ হিন্দুস্তান মেঁ রিভাইজড করে পুনর্মুদ্রন হয়েছে। লেকচার লুধিয়ানা কিতাবের ইংরেজী অনুবাদ এবার ছেপেছে।

'মাহযার নামা'-র ইংরেজী অনুবাদ ছেপেছে। আরো ছোট ছোট কতকগুলো প্রয়োজনীয় বই বিভিন্ন ভাষায় ছেপেছে। হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রাহেঃ) পুস্তক 'ইরফানে ইলাহী' ফরাসী ভাষায় ছেপেছে। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (রহঃ)-এর কয়েকটি বক্তৃতা ইংরেজী ও একটি বক্তৃতা ডেনিস ভাষায় ছেপেছে। আল্লাহ্‌তাআলা আমাদের সকল প্রকাশনা মানবজাতির জন্য আমাদের সকলের জন্য বরকতময় করুন।

বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন শহরে 'বই মেলার' মাধ্যমে এক লক্ষের বেশি মানুষকে দাওয়াত পৌছানো হয়েছে।

রাকীম প্রেস ইসলামাবাদ থেকে এ বছর দুই লক্ষ ২৯ হাজার একশ' বই-পত্র প্রকাশিত হয়েছে। এ বছর আরবী ভাষায় প্রায় ৩৭ খানা পুস্তক-পুস্তিকা ছেপেছে। আরো ১৫ খানা বই-পুস্তকের অনুবাদের রিভাইজড কাজ চলছে। তফসীরে কবীর-এর ৩ খন্ড ছেপে গেছে। এ বছর আর এক খন্ড প্রস্তুত হয়ে গেছে। ইন্টারনেটের মাধ্যমে বিভিন্ন বই প্রচার করা হয়েছে।

চায়না ডেস্কের চেষ্টায় চীনা ভাষায় কুরআনের অনুবাদ আগেই প্রকাশ হয়েছে। তাছাড়া এ যাবত ১১ খানা বই অনুবাদ হয়ে ছেপেছে। এম, টি, এতে প্রচারের জন্য চীনা ভাষায় কুরআনের অনুবাদ রেকর্ড হয়েছে। ইন্টারনেটেও অনেক কিছু দেয়া হচ্ছে।

বিভিন্ন দেশে ফরাসী ভাষায় যা কিছু ছাপার জন্য প্রস্তুত হয় তা ছাপার পূর্বে ফ্রেন্স ডেস্কে রিভাইজড করা হয় তারপর ছাপা হয়। এম. টি.এতে অনেক কিছু পেশ করা হচ্ছে।

বাংলা ডেস্কের ইনচার্জ মাওলানা ফিরোজ আলম সাহেব। তার প্রধান দায়িত্ব এম, টি, এর জন্য বাংলা অনুবাদ প্রস্তুত করা। এ যাবৎ বাংলা ডেস্ক থেকে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (রাহেঃ) পরিচালিত ১৫০টি মজলিসের আলোচনা, কুরআন ক্লাস ৩০০ লেকা মায়াল আরব ৪৪০, হোমিও প্যাথীর ২০০ ক্লাসের অনুবাদ এবং প্রায় ৫০০ খুতবা জুমুআর অনুবাদ প্রস্তুত হয়ে গেছে। এম, টি, এতে নিয়মিত প্রচার হচ্ছে।

নুসরত জাহাঁ স্কীমের অধীনে আফ্রিকার ১২টি দেশে ৩৬ হাসপাতাল ও ক্লিনিকে কর্মরত, ৮দেশে ৩৭৩ বিভিন্ন স্ট্যান্ডার্ডের স্কুল চালু আছ। আমি আহমদী ডাক্তারদের কাছে আপিল করছি তারা যেন

আফ্রিকার হাসপাতালের জন্য ৩/৬/৯ বছরের জন্য ওয়াকফ করেন। রাবওয়াহ্-এর ফযলে ওমর হাসপাতালের জন্যও ডাক্তারের প্রয়োজন রয়েছে।

প্রেস এন্ড পাবলিকেশন ডেস্কে ৪ জন কর্মরত আছেন। এ যাবত মোট ২৬,৩২১ জন ওয়াকেফীনে নও সন্তান পাওয়া গেছে। এর মাঝে ছেলে ১৭,৬৮০ জন এবং মেয়ে শিশু ৮,৬৪১ জন, আল্হামদুলিল্লাহ্। এর মাঝে মোট ১৭,০০০ পাকিস্তানী সন্তান।

এম, টি, এ -এর প্রচার ও প্রসার বেড়েই চলেছে। গীয়ানা এবং ফীজীর কোন কোন অঞ্চলে এম, টি, এ দেখা যেত না এখন দেখা যাচ্ছে। এম, টি, এ-এর প্রোগ্রামগুলো সফটওয়ারেও সংরক্ষণ করা হচ্ছে।

মূল্যবান ছবি ও ভিডিওসমূহকে বিশেষভাবে সংরক্ষণের কাজ চলছে।

আইভরী কোস্টের মুরব্বী সাহেব লিখেছেন, আইভরী কোস্টের বিদ্যুৎ বিভাগের প্রাদেশিক ডাইরেক্টর আল্ হাসান জিবাতেকে এম, টি, এ সম্পর্কে বললাম। তিনি বললেন, আমি আজই দেখব। এক সপ্তাহ পরই তিনি নিজে আমার বাসায় এসে হাজির। তিনি বললেন, 'আজকের যুগে, এই অশ্লীলতার যুগে আমাদের সকলের সন্তানের ভবিষ্যৎ এম,টি,এ-এর হাতে। আমি জামাতের কাছে শুকরিয়া আদায় করছি।'

নাইজেরীয়ার মুরব্বী ইনচার্জ লিখেছেন, "আমি ট্যুরে ছিলাম। রাস্তায় একটি মসজিদে গিয়ে আমি পরিচয় করালে ইমাম সাহেব আমাকে তাঁর বাড়ীতে নিয়ে গেলেন। দেখালেন সেই অঞ্চলের বিশিষ্ট ব্যক্তিরা বসে এম,টি,এ দেখছেন। তারা বললেন, আমরা বিগত ৬ বছর ধরে এম,টি,এ দেখছি। কিন্তু আজ আপনিই এক আহমদী যার সাথে আমাদের সাক্ষাৎ হলো। এদের মাঝে একজন দেশের বিশিষ্ট নেতাও ছিলেন। বললেন, আমরা আরবী ইংরেজী প্রোগ্রাম দেখি। বাংলা ইন্দোনেশীয়ার ভাষা বুঝি না, কিন্তু তাদের তেলাওয়াত ও নযম আমাদের শুনতে খুব ভাল লাগে। হুযূর (আইঃ) বললেন, 'আসলেও বাংলা ও ইন্দোনেশিয়ার তেলাওয়াত ও নযম শুনতে খুব ভাল লাগে'।

এম,টি,এ ছাড়াও বিভিন্ন দেশের রেডিও, টিভির মাধ্যমে আমাদের প্রচার কাজ চলছে। এ বছর ১০২২ টি, ভি, প্রোগ্রামের মধ্যে ১৪৪০ ঘন্টা প্রচারের মাধ্যমে তিন কোটির বেশি দর্শকদের কাছে প্রচার পৌছানো হয়েছে।

অনুরূপভাবে রেডিও, বিশেষ করে আফ্রিকার বিভিন্ন দেশে রেডিওতে আমাদের প্রোগ্রাম প্রচার হচ্ছে। সপ্তাহে ২৮ ঘন্টার নিয়মিত প্রোগ্রাম প্রচার চলছে। তাছাড়া রমযান মাসে বিশেষ প্রোগ্রাম প্রচার হয়ে থাকে।

বুরকিনাফাসুর একটি শহরে 'আহমদীয়া রেডিও ষ্টেশন' চালু হয়েছে এ বছর। প্রতিদিন ১৩ ঘন্টা প্রচার চলে। প্রায় দশ লক্ষের বেশি মানুষ প্রচার শুনছে। আগামীতে প্রতিদিন ১৭ ঘন্টা চালু করা হচ্ছে। বহু মানুষ আমাদের রেডিও ও টিভি প্রোগ্রামের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। এখানে সব কথা বলা যাচ্ছে না। একজন প্রফেসর লিখেছেন, ইতোপূর্বে তিনি কোন মৌলভীর বক্তৃতা শুনলেই রেডিও বন্ধ করে দিতেন। ইসলামের বিরুদ্ধে কথাও বলতেন। এখন তিনি আহমদীয়া রেডিও শোনার পর থেকে তিনি আবার ইসলামের দিকে ঝুঁকতে থাকেন এবং পরে আহমদী হয়েছেন। ঘানা রেডিওতে আমাদের নিয়মিত প্রোগ্রাম চলে। একবার খ্রীষ্টান চার্চের পক্ষ থেকে আমাদের জন্য নির্ধারিত সময় থেকে কর্তন করে তাদের জন্য সময় চেয়েছিলেন। কিন্তু কর্তৃপক্ষ চার্চকে সে সময় দেন নি। বহু দেশে আমাদের নিয়মিত রেডিও, টি, ভি, প্রোগ্রাম সে দেশের রেডিও, টি, ভিতে নিয়মিত প্রচার হচ্ছে।

বহু দেশে হোমিওপ্যাথী চিকিৎসাকেন্দ্র চালু করা হয়েছে। ৫৫টি দেশে ৬৩২টি ছোট বড় চিকিৎসা কেন্দ্র কায়েম হয়েছে। এ বছর এক লক্ষ ৯১ হাজার মানুষের ফ্রী চিকিৎসা দেয়া হয়েছে। এ ক্ষেত্রে রং বর্ণ ধর্মের কোন পার্থক্য নেই। জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সবাইকে চিকিৎসা দেয়া হয়। ইংল্যান্ড, জার্মানীর মত দেশেও হাজার হাজার রোগীর চিকিৎসা করা হয়েছে। আফ্রিকার অনেক দেশে, ইন্দোনেশীয়া ইত্যাদি দেশে এ ব্যবস্থা রয়েছে। রাবওয়াহ্-য় "তাহের হোমিও রিসার্চ ইন্স্টিটিউট" কায়েম হয়েছে। হাজার হাজার মানুষ চিকিৎসা পাচ্ছেন। বহু দূরারোগ্য রোগের চিকিৎসা করা হয়েছে। কোন কোন মহিলার সন্তান হোত না; কোন কোন মহিলার মেয়ে হোত ছেলে সন্তান হোত না। এ ধরনের বহু রোগীর রোগমুক্তি হয়েছে, আল্হামদুলিল্লাহ্।

অনেক গরীব দেশের গরীব মানুষকে আর্থিক সাহায্য দেয়া হচ্ছে। ভারত, বাংলাদেশ, আফ্রিকার দেশসমূহে এখন সাহায্য বেশি যাচ্ছে।

"হিউম্যানিটি ফার্ষ্ট" আহমদীদের একটি আন্তর্জাতিক সংস্থা। বিভিন্ন দেশের দুর্যোগে পতিত মানবতার সেবা করা এ সংস্থার কাজ। ইদানিং ইরাকের অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ইরাকে সাহায্য পাঠানোর প্রস্তুতি নেয়া হয়েছে। এ সংস্থার কর্মসূচী অনেক ব্যাপক ও সুদূর প্রসারী। (এটি রেড ক্রসের মত একটি সংস্থা)।

এ বছর ভারতে বয়াতের সংখ্যা এক লক্ষ উনিশ হাজার ছয়শ' পঁচিশ। ৬৫ জন মসজিদের ইমাম বয়াত করেছেন। যারা বয়াত করেছেন তাদের মাঝে খুব ভাল পরিবর্তন করা যাচ্ছে। বয়াতের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য দেশ, যেমন কেনিয়াতে ১,৬৩,১৮৩ জন বয়াত করেছেন।

ইথিওপিয়া ৭৪,০০০ জন, বুরকিনাফাসু - ৯২ হাজারের বেশি, নাইজেরীয়া- ২ লক্ষ ৬ হাজারের বেশি। বাংলাদেশ- ১৩০০ এর বেশি। জার্মানী ১২৫, ফ্রান্স ৮০; হাঙ্গেরী - ১৯; কসভো ১৩ বয়াত। মোট বয়াত ৮,৯২,৪০৩ বয়াত সারা পৃথিবীতে হয়েছে, আল্হামদুলিল্লাহ্।

নাইজার। এদেশের সব বাদশাহ্দের বড় বাদশাহ্ সুলতান আহমদী হয়েছেন। ইনি নিজ দেশের প্রেসিডেন্টের সর্বোচ্চ পরামর্শ পরিষদের চারজন সদস্যের একজন। তিনি এখানে জলসায় উপস্থিত আছেন। (ষ্টেজে চেয়ারে বসা আছেন)।

বেনীন, আমরা জামাতি টুরে সফর করছিলাম। আমাদের গাড়ীর উপর স্পীকার সেট করা ছিল। সূরা রহমানের তেলাওয়াত হচ্ছিল। আমাদের জামাত মদকা' পৌছে কাজ শেষ করে ফিরত আসছিলাম। এক স্থানে দেখলাম, ডোই গ্রামে যুবকদের বড় ভীড়। তারা রাস্তা বন্ধ করে দাঁড়িয়ে আছে। আমরা গাড়ী দাঁড় করালাম। তারা জোরালো আবেদন জানালেন যে, তাদের গ্রামে যেতে হবে। আমরা অগত্য গেলাম। আহমদীয়ত পরিচিতি মূল বক্তব্য ও আলোচনা পেশ করলাম। তারা বললেন, তারা আহমদী হবেন। আমরা বুঝিয়ে বললাম যে, এভাবে ঠিক হবে না। আপনাদের মসজিদ আছে, ইমাম আছেন, চীফ আছেন তাদের সাথে পরামর্শ করেন, দেখেন তারা কি বলেন।

দু'দিন পর এ যুবকদের একটি প্রতিনিধিদল আমাদের মুরব্বী হাউজে আসলেন। ৩৫ মাইল সফর করে আসলেন এবং বললেন, সারা গ্রাম ৪০০০ মানুষ আহমদীয়ত কবুল করেছেন।

এ ধরনের অনেক ঈমানবর্ধক ঘটনা হুযূর (আইঃ) বর্ণনা করেছেন। কিন্তু বিরোধিতাও হয় সব সময়ই।

সেনেগালে জামাতের বিরোধিতা হচ্ছিল। একবার এক বিরোধী ব্যক্তি হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর আরবী কাসিদা "ইয়া আয়না ফায়যিল্লাহে ওয়ার ইরফানী' শুনে আহমদী হয়ে গেলেন।

বাগাডু গু রিজওনে একবার খোদ্দামুল আহমদীয়ার ইজতেমার কর্মসূচী নেয়া হয়েছিল। পাশের এলাকা থেকে মৌলভী সাহেব বিরোধিতা করলেন। বললেন, আহমদীরা মুসলমান নয়। এদের

ইজতেমা হতে দেয়া যায় না। কিন্তু ইজতেমা যে গ্রামে হতে যাচ্ছে সেগ্রামের লোকেরা বলল, ইজতেমা হবে। আপনারাও এসে শুনবেন। আপত্তি থাকলে তা পেশ করবেন। মৌলভী সাহেব দলবল নিয়ে উপস্থিত হলেন। কিন্তু পরিশেষে ভাল স্বীকার করলেন এবং আহমদীয়ত কবুল করলেন। এটা আফ্রিকানদের গুণ যে, ভুল বুঝতে পারলে আর বিরোধিতা করেন না। হযরত আমীরুল মু'মিনীন (আইঃ) অনেক ঈমানবর্ধক ঘটনা বর্ণনা করেছেন। যারা শত্রুতা করে তাদের পরিণাম খারাপ হয়।

তাংগু অঞ্চলে আমাদের তবলীগে কিছু লোক বয়াত করলেন। একটি মসজিদও ছিল তাদের। পরে আশপাশ থেকে মৌলভীরা এসে এখানকার নও মুবায়েঈনদের খুব ধমকা-ধমকি করল এবং তাদের মসজিদ ও তাদের থেকে কেড়ে নিয়ে অন্যদের হাতে দিয়ে দিল। কিছু কাল পরে জামাত নতুন মসজিদ নির্মাণ শুরু করলে আবার বিরোধিতা আরম্ভ হয়ে গেল।

এক ব্যক্তি কালো জাদুর মাধ্যমে মসজিদের কাজ নষ্ট করবে বলে ঘোষণা দিল। আফ্রিকায় সর্বত্র জাদুকে সবাই ভয় করে। একদিন রাতে সেই ব্যক্তি মসজিদের পাশে গিয়ে জাদু মন্ত্র পড়তে আরম্ভ করে দিল। কিছুক্ষণ পরই চিৎকার করতে করতে দৌড়ে পালাতে থাকল। পরের দিন সে ঘোষণা করল আহমদীদের বিরাট বড় জাদুকর আছে। আমার জাদু ব্যর্থ হয়েছে। গত রাতে আমি যখন জাদু-মন্ত্র পড়ছিলাম তখন এদের মসজিদের পাশ থেকে কালো সাপ বেরিয়ে আমাকে তাড়া করেছিল। এভাবে সেখানকার বিরোধিতা দূর হয়ে গেল।

ডাঃ ফজলুর রহমান সাহেব লিখেছেন, 'আমাদের হাসপাতালে একদিন এক ব্যক্তি এসে খুব গালি-গালাজ আরম্ভ করে দিল। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর ছবির প্রতি ডান হাত দিয়ে ইঙ্গিত করে অশ্রাব্য গালি-গালাজ করতে থাকল। কিছুক্ষণ পর সে রাস্তায় নেমে কিছু দূর গেলে দুর্ঘটনা পতিত হয়ে তার হাত ভেঙ্গে গেল।

গেম্বিয়ায় উর্মিলা গ্রামে এবং আশপাশের গ্রাম প্রধানরা মিটিং করে ঘোষণা করল যে, অত্র অঞ্চলে আহমদীদের মসজিদ বানাতে দেয়া হবে না। কয়েকজন প্রধান আহমদীদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ প্রচার করল।

আল্লাহ্‌র তরফ থেকে এ রকম ঘটনা ঘটল যে, এদের মাঝে একজন গ্রাম প্রধান হঠাৎ পড়ে গিয়ে মারা গেল। অপর এক গ্রামের প্রধান রোগাক্রান্ত হলো। হাসপাতালে নেয়া হলে ডাক্তারা বলেন, এর কোন চিকিৎসা নেই। কিছুদিন পর অত্যন্ত মর্মান্তিক অবস্থা হয়ে সে মারা গেল।

অপর এক গ্রামে আহমদীরা মসজিদ নির্মাণ করেছিলেন। গ্রাম প্রধান আহমদীদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নিয়ে জরিমানা করে দিল সবার উপর। কয়েকজন আহমদীকে বন্দী করে রাখল তিন দিন। কিছুদিন পরই সেই গ্রাম প্রধান সরকারীভাবে পদচ্যুত হয়ে গেল। এসব ঘটনার ফলে আশপাশে অনেক লোক আহমদী হয়েছেন।

ডোরো রিজনের ওহাবীরা সুদান থেকে মৌলভী হাসান গুররাকে ডেকে আনলো। এ মৌলভী এতদঞ্চলে আহমদীদের বিরুদ্ধে প্রচার চালাতে থাকল। আহমদীয়া জামাতের পক্ষ থেকে তাকে প্রতিযোগিতার আহ্বান করা হলে সে কৌশলে এড়িয়ে যেতে থাকল। অগত্যা আহমদীরা সেই মৌলভীর বক্তব্য এবং আপত্তিগুলোকে খন্ডন করে ঘোষণা দিল যে, আমরা মিথ্যাবাদীর উপর অভিশাপের দোয়া করি। একদিন মৌলভী হাসান জুমুআর নামাযের সময় এক আহমদী মসজিদে গিয়ে ঘোষণা দিল, "হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আঃ) মিথ্যা"। আমি কসম খেয়ে বলছি আমি যদি মিথ্যাবাদী হই তাহলে আমার উপর আল্লাহ্‌র লা'নত হোক।" সবাই বললেন, ঠিক আছে, এখন আল্লাহ্ ফয়সালা করবেন। কিছুদিন পরই সে রোগাক্রান্ত হয়ে পড়ল। হাসপাতালের ডাক্তারেরা বললেন, তাকে ঘানা নিয়ে যাও। ঘানা নিয়ে গিয়ে আহমদী হাসপাতালে ভর্তি করাল। তাদের কাছে এর চেয়ে ভাল ব্যবস্থা সম্ভব ছিল না। আহমদীয়া হাসপাতালে ভর্তি হলে ডাক্তাররা বললেন, পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে আগামীকাল অপারেশন করা হবে। কিন্তু আল্লাহ্‌র ইচ্ছা, সেই মৌলভী রাতে পায়খানায় গিয়ে সেখানেই মারা যায়।

এ ঘটনা অত্র অঞ্চলে বিরোধিদের মনে ভীতির সঞ্চার করেছে। বাংলাদেশের জামালপুর জেলা কাবাড়িয়া বাড়ী গ্রামের এক অঞ্চলে এ ঘটনা ঘটেছে। এখানে আমাদের তবলীগী মিটিং-এর আয়োজন করা হয়েছিল। মৌলভীরা এলাকার গুন্ডাদেরকে আমাদের আহমদী তবলীগী টীমের বিরুদ্ধে নিযুক্ত করে। ফলে গুন্ডার দল আমাদের আহমদীদের মারধর করে। ওদের মাঝে একজন জসীম ডাকাতও ছিল। ঘটনার পর জসীম ডাকাতের উপর পক্ষঘাতের আক্রমণ হয়েছে এবং শরীরের নীচের অংশ অবশ হয়ে গেছে। সে পরবর্তিতে উপলব্ধি করেছে যে, আহমদীদের উপর অত্যাচারের ফলে এমন হয়েছে। তিনি আমাদের আহমদী ভাইকে পত্র লিখে ভুল স্বীকার করে ক্ষমা চেয়েছেন। একথাও লিখেছেন যে, আমার বিশ্বাস আপনারা আমাকে ক্ষমা করে দোয়া করলে আমি ভাল হয়ে যাব। আরো অনেক ঈমানবর্ধক ঘটনা হুযূর (আইঃ) বর্ণনা করেছেন।

২৭শে জুলাই সকালের অধিবেশনে তেলাওয়াত ও নযমের পর মোহতরম হাফেয মুজাফ্ফর আহমদ সাহেব সীরাতুন্ নবী (সঃ)-এর বিষয়ে বক্তব্য দিয়েছেন। তারপর মোহতরম আব্দুল গনী জাহাঙ্গীর সাহেব ফ্রেন্স ডেস্কের ইনচার্জ হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে' (রাহেঃ)-এর জীবনের মূল্যবান কিছু ঘটনা শুনিয়েছেন। তারপর বক্তব্য রেখেছেন জনাব রফিক আহমদ হায়াত সাহেব, আমীর জামাত ইউ, কে।

বিকাল বেলায় বাংলাদেশ সময় ৬.০০ হযরত খলীফাতুল মসীহ্ খামেস (আইঃ) বিশ্ব বয়াত অনুষ্ঠানে বয়াত গ্রহণ করেন। এ বছর আল্লাহ্‌র অশেষ ফযল ও রহমতে ৯৮টি দেশের ২২৯টি জাতির মোট ৮ লক্ষ ৯২,৪০৩ জন বয়াত করেছেন, আল্‌হামদুলিল্লাহ্। বয়াত শেষে হুযূর (আইঃ)-এর সাথে সবাই সিজদায় পড়ে যান, সুবহানাল্লাহ্!

২৭ জুলাই বাংলাদেশ সময় রাত ৯.৩০ মিঃ হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আইঃ) এবারের জলসায় সমাপনী ভাষণ আরম্ভ করেন।

তেলাওয়াত ও নযমের পর হুযূর (আইঃ) তাঁর সমাপনী ভাষণে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) প্রণীত বয়াতের দশটি শর্ত নিয়ে আলোচনা করেন। হুযূর (আইঃ) বলেন, আমরা বয়াত করি। কিন্তু কিসের উপর বয়াত করি তা জানা দরকার। হুযূর (আইঃ) সর্বপ্রথম হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর লেখার উদ্ধৃতি পড়ে জানান যে, বয়াত কী, কাকে বলে, বয়াতের অর্থ কী? বয়াত অর্থ নিজেকে ইসলামের হাতে বিক্রি করে দেয়া। বয়াতের পরে বয়াতকারী নিজেকে সম্পূর্ণরূপে বিক্রি করে দেয় ইমামের হাতে। বয়াতের পরে বয়াতকারীর নিজ ইচ্ছা বলতে কিছু থাকে না। সে সম্পূর্ণরূপে ইমামের নির্দেশমত জীবন-যাপন করবে।

তারপর হুযূর (আইঃ) বয়াতের এক একটি শর্ত নিয়ে কুরআন হাদীস ও হযরত ইমাম মাহ্দী (আঃ)-এর ব্যাখ্যার আলোকে বিশ্লেষণ করতে থাকেন। সবগুলোকে শর্তের উপর আলোচনার সময় ছিল না। বাকী শর্তগুলোর উপর আলোচনা হুযূর (আইঃ) পরবর্তিতে বর্ণনা করবেন।

বিষয়টি অতি গুরুত্বপূর্ণ ও অত্যন্ত জরুরী হওয়ার কারণে খাকসার এর সারাংশ করার সাহস করছি না। সম্ভব হলে পরবর্তিতে পুরো বিষয়টি অনুবাদ হয়ে প্রকাশ হওয়া আবশ্যক, ইন্‌শাআল্লাহ্।

(ধারণকৃত ওডিও ক্যাসেট শুনে নিজ ভাষায় সারসংক্ষেপ পেশ করেছি)।

সংকলন ঃ মাওলানা মুহাম্মদ ইমদাদুর রহমান সিদ্দিকী
মুরব্বী সিলসিলাহ্

মুনাজাতে রসূল (সঃ)

[রসূলে করীম (সঃ)-এর হৃদয়োত্তাপপূর্ণ ও প্রভাব সৃষ্টিকারী দোয়া]

মূল সংকলন ঃ হাফেয মুযাফ্ফর আহমদ, রাবওয়া

(৪০তম কিস্তি)

দরিদ্রাবস্থার একটি আশ্চর্য দোয়া

□ হযরত আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) নবী করীম সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের নিকট থেকে এ দোয়া বর্ণনা করতেন ঃ

اَللّٰهُمَّ اَحْيِنِىْ مِسْكِيْنًا وَتَوَفَّنِىْ مِسْكِيْنًا وَاحْشُرْنِىْ فِىْ زُمْرَةِ الْمَسَاكِيْنِ وَاِنَّ اَشْقَى الْاَشْقِيَاءِ مَنِ اجْتَمَعَ عَلَيْهِ فَقْرُ الدُّنْيَا وَعَذَابُ الْاٰخِرَةِ۔ (ترمذی کتاب الدعوات)

(আল্লাহুম্মা আহ্ঈনী মিসকীনান ওয়া তাওয়াফ্ফানী মিসকীনান ওয়াহ্শুরনী ফী যুমরাতিল মাসাকীনি ওয়া ইন্না আশক্বাল আশক্বিয়াই মানিজতামা'আ আলায়হে ফাক্বরুদ্দুনয়া ওয়া 'আযাবুল আখিরাতি - তিরমিযী, কিতাবুদ্ দাওয়াত)

অর্থ ঃ হে আল্লাহ্! আমাকে দরিদ্রাবস্থায় জীবিত রাখ। দরিদ্রাবস্থায় মৃত্যু দাও এবং দরিদ্রদের দলে যেন আমার হাশর হয়। নিশ্চয় সব্চে' হতভাগ্য সে যার ওপর পার্থিব দরিদ্রতা ও পরকালের শাস্তি উভয়েই সম্মিলিত হয়ে যায়।

আল্লাহ্তাআলার বিশেষ বান্দা হওয়ার দোয়া

□ আবদুল কায়েস-এর দল (যারা ইয়েমেন থেকে মদীনায় উপস্থিত হয়েছিল) বর্ণনা করতেন যে, তারা নবী করীম সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামকে এ দোয়া পাঠ করতে শুনেছেন ঃ

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنَا مِنْ عِبَادِكَ الْمُنْتَخَبِيْنَ الْغُرِّ الْمُحَجَّلِيْنَ الْوَفْدِ الْمُتَقَبَّلِيْنَ۔ (مسند احمد مطبوعہ بیروت جلد ۳ صفحہ ۴۳۱)

(আল্লাহুম্মাজ'আলনা মিন ইবাদিকাল মুনতাখাবীনাল গুর্রিল মুহাজ্জালীনাল ওয়াফদিল মুতাক্ব্বিলীন- মুসনাদ আহমদ বিন হাম্বল, বৈরুতে মুদ্রিত, ৩খন্ড, পৃষ্ঠা ৪৩১)।

অর্থ ঃ হে আল্লাহ্! আমাদেরকে তোমার মনোনীত বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত কর যাদের কপাল জোতির্ময় ও উজ্জ্বল। এমন দলের অন্তর্ভুক্ত কর যারা গৃহীত হয়েছে।

দলের লোকেরা বলে, আমরা জিজ্ঞেস করলাম হে আল্লাহ্র রসূল! মনোনীত বান্দা দ্বারা কী বুঝাচ্ছেন? তখন হুযূর সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম বল্লেন, খোদার নেক ও পুণ্যবান বান্দা আর গুররিল মুহাজ্জালীন দ্বারা সেসব লোক বুঝায় যাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ওযূর কারণে জোর্তিময় ও উজ্জ্বল হয়েছে এবং ওয়াফদিল মুতাক্ব্বিলীন দ্বারা বুঝায় উম্মতের সেসব লোক যারা নিজ নবীর সাথে খোদার দরবারে উপস্থিত হবে।

খোদাতাআলার পবিত্র নামের দোহাই দিয়ে দোয়া

□ হযরত আয়েশা (রাঃ) রসূলে করীম সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের এ দোয়া করতে শুনেন ঃ

اَللّٰهُمَّ بِاسْمِكَ الطَّاهِرِ الطَّيِّبِ الْمُبَارَكِ الْاَحَبِّ اِلَيْكَ الَّذِىْ اِذَا دُعِيْتَ بِهٖ اَجَبْتَ وَاِذَا سُئِلْتَ بِهٖ اَعْطَيْتَ وَاِذَا اسْتُرْحِمْتَ بِهٖ رَحِمْتَ وَاِذَا اسْتُفْرِجْتَ بِهٖ فَرَّجْتَ۔ (ابن ماجہ کتاب الدعاء)

(আল্লাহুম্মা বিসমিকাত্ত্বা-হিরি ত্ত্বায়্যিবিল মুবারাকিল আহাব্বি ইলায়কাল্লাযী ইযা দু'ঈতা বিহী আজাবতা ওয়া ইয়া সুইলতা বিহী আ'ত্ত্বায়তা ওয়া ইযাসতুরহিমতা বিহী রহিমতা ওয়া ইযাস্তুফরিজতা বিহী ফার্রাজতা - ইবনে মাজাহ্, কিতাবুদ্ দোয়া)

অর্থ ঃ হে আল্লাহ্! তোমার এ পাক ও পবিত্র এবং কল্যাণমন্ডিত এবং সবচে' প্রিয় নামের দোহাই, যে নাম নিয়েই তোমাকে ডাকা হয় তুমি দোয়া কবুল করে থাক আর যখন সেই নাম নিয়ে তোমার কাছে চাওয়া হয় তুমি দিয়ে থাক। আর যখন সেই নামে তোমার কাছে কৃপা ভিক্ষা করা হয় তখন তুমি কৃপা কর আর সেই নামের দোহাই দিয়ে তোমার কাছে বিপদ থেকে মুক্তি পাওয়ার আশা করা হয় তখন তুমি বিপদ দূর করে দিয়ে থাকো।

একটি সম্মিলিত দোয়া

□ হযরত আবূ আমামাহ্ (রাঃ) বলেন, রসূলে করীম সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম আমাদের মাঝে আসলেন। আমরা সম্মান দেখাতে দাঁড়িয়ে গেলাম এবং দোয়ার আবেদন করলাম। তিনি (সঃ) দোয়া করলেন, আমরা আরও দোয়া চাইলাম তখন তিনি বল্লেন, এ দোয়ার মাঝে তোমাদের সবটা দোয়া জমা করা হয়েছে। দোয়াটি এই ঃ

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلَنَا وَارْحَمْنَا وَارْضَ عَنَّا وَتَقَبَّلْ مِنَّا وَاَدْخِلْنَا الْجَنَّةَ وَنَجِّنَا مِنَ النَّارِ وَاَصْلِحْ لَنَا شَانَنَا كُلَّهٗ۔ (ابن ماجہ کتاب الدعاء)

(আল্লাহুম্মাগ্ফিরলানা ওয়ার হামনা ওয়ারযা 'আন্না ওয়া তাক্বাব্বাল মিন্না ওয়াদখিলনাল জান্নাতা ওয়া নাজ্জিনা মিনান্নারি ওয়াস্লিহ্ লানা শানানা কুল্লাহূ - ইবনে মাজাহ্, কিতাবুদ্ দোয়া)

অর্থ ঃ হে আল্লাহ্! আমাদেরকে ক্ষমা কর। আমাদের প্রতি কৃপা কর। আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট হও আর আমাদের থেকে (দোয়া ও ইবাদত) কবুল কর এবং আমাদেরকে জান্নাতে প্রবিষ্ট কর ও আগুন থেকে রক্ষা কর আর আমাদের সব কাজ তুমি সম্পন্ন করে দাও।

দোয়া কবুল হওয়ার পর পঠিতব্য দোয়া

□ হযরত আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেন। নবী করীম সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তোমাকে এ দোয়া পাঠ করা থেকে কিসে বাধা দেয়, যখন নিজের দোয়া কবুল হওয়ার খবর পাও যেমন, রোগ থেকে মুক্তি লাভ কর, সফরে সফল হও, তখন এ দোয়া পাঠ কর ঃ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ بِعِزَّتِهٖ وَجَلَالِهٖ تَتِمُّ الصَّالِحَاتُ۔ (مستدرک حاکم مطبوعہ بیروت جلد ۱ صفحہ ۷۳۰)

(আল্হামদুলিল্লাহিল্লাযী বিইয্যাতিহী ওয়া জালালিহী তাতিম্মুস্ সলিহাতু - মুস্তাদরাক হাকিম, বৈরুতে মুদ্রিত, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা ৭৩০)

অর্থ ঃ সমস্ত প্রশংসা সেই সত্তার যাঁর সম্মান ও প্রতাপের সাথে সকল পুণ্য কাজ চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে।

শেষ পরিণতি জন্যে দোয়া

□ হযরত বুসর (রাঃ) বিন আরত্বত নবী করীম সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামকে এ দোয়া পাঠ করতে শুনেছেন ঃ

اَللّٰهُمَّ اَحْسِنْ عَاقِبَتَنَا فِى الْاُمُوْرِ كُلِّهَا وَاَجِرْنَا مِنْ خِزْيِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْاٰخِرَةِ۔ (مستدرک حاکم مطبوعہ بیروت جلد ۳ صفحہ ۵۹۱)

(আল্লাহুম্মা আহসীন 'আক্বিবাতানা ফীল উমূরী কুল্লিহা ওয়া আজিরনা মিন খিযইদ্দুনয়া ওয়া 'আযাবিল আখিরাতি - মুস্তাদরক হাকিম, বৈরুতে মুদ্রিত, ৩ খন্ড, পৃষ্ঠা ৫৯১)

অর্থ ঃ হে আল্লাহ্! সকল কাজের পরিণতি উত্তম কর। আমাদেরকে পৃথিবীর দুঃখ-কষ্ট ও আখেরাতের আযাব থেকে রক্ষা কর। (চলবে)

অনুবাদ - মোহাম্মাদ মুতিউর রহমান

মুসলিম মানসে 'খিলাফত' তথা 'উলীল আমর'

(৭ম কিস্তি)

ওসমানীয়া শাসনামলে অর্থাৎ তুরস্কের খিলাফতের যামানায় আরব রাষ্ট্রগুলোও এ খিলাফতের আওতায় একটি একক মুসলিম উম্মাহ্‌র পরিমন্ডলে ঐক্যবদ্ধ ছিল। অতঃপর তুর্কী সালতানাতের নানাবিধ সমস্যা, রুশ-তুর্কী যুদ্ধ, বলকান যুদ্ধের বিপর্যয় এবং বিশেষ করে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শোকাবহ পরিণতিতে ফ্রান্স ও বৃটেনের প্ররোচনায় আরও রাষ্ট্রগুলোতে ভৌগলিক জাতীয়তাবাদের অভ্যুত্থান ঘটতে থাকে। বৃটিশ ভারতেও এই সময়ে নিয়মতান্ত্রিক পন্থায় জাতীয়তাবাদী আন্দোলন জোরদার হতে থাকে। ভারতীয় আন্দোলন প্রথম দিকে ভারতীয়-ই ছিল। কিন্তু, পরে হিন্দু জাতীয়তাবাদী এবং আরও পরে মুসলিম জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে রূপ পরিগ্রহ করে। এই পরিস্থিতিটার সৃষ্টি হয় নানা কারণে। যেমন, ১০৯৫ সালের বঙ্গ বিভাগ হিন্দু জাতীয়তাবাদীদের উগ্র আন্দোলনের মুখে ১৯১১ সালে রদ হয়ে যায়; মুসলিম জনগণের স্বার্থে প্রস্তাবিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা (যাকে হিন্দু উগ্র জাতীয়তাবাদীরা উপহাস করে বলতো মক্কা বিশ্ববিদ্যালয়) স্থগিত হয়ে যায়। এবং এই বিশ্ববিদ্যালয় যখন ১৯২১ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন ওদিকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয়টিকে বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরিত করেন। বাংলার সংখ্যাগরিষ্ঠ অবহেলিত ও অবদমিত মুসলিম জনসাধারণের পশ্চাদপদতা থেকে উত্তরণের লক্ষ্যে বাবু চিত্তরঞ্জন দাস যে প্রস্তাবাবলীর ঘোষণা দিয়েছিলেন, তা সবই কংগ্রেস কর্তৃক অগ্রাহ্য হয়ে যায়। পরিণতিতে মওলানা আবুল কালাম আযাদের কথায় - 'বাংলার মুসলমানরা কংগ্রেস থেকে দূরে সরে যায় এবং এভাবেই দেশভাগের প্রথম বীজ বোনা হয়।"

(India wins Feedom ঃ বঙ্গানুবাদ ঃ সুভাষ মুখোপাধ্যায়, পৃঃ ২২)।

বিশেষ করে উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশকে এবং বিংশ শতাব্দীর সূচনাতে 'গণেশ উৎসব' 'শিবাজী উৎসব' 'গো- হত্যা বিরোধী' যে সমস্ত উগ্র হিন্দু জাতীয়তাবাদী আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ছিল এর ফলে দলিত মুসলিম সম্প্রদায়ের স্বাতন্ত্র্য চেতনা জাগ্রত হয়ে ওঠে। এসব আন্দোলকারীরা তাদের ভারতীয়তার নামে জাতীয় অধিকার ও স্বীকৃতির ক্ষেত্রে কোন প্রকার ছাড় দিতে প্রস্তুত ছিল না। সম্প্রীতি ও সমঝোতা তাদের উগ্র হিন্দু চেতনার চিতায় দগ্ধীভূত হচ্ছিল। এক ধর্ম-রাষ্ট্র গঠনের রোমান্টিক শূন্যতায় অন্য সবাইকে লীন করে দিতে চাচ্ছিল।

অতএব হিন্দু জাতীয়তাবাদীদের আপোষহীন উগ্র মনোভাবের দরুন বৃটিশ ভারতে মুসলিম জাতীয় চেতনা পুনর্জাগরিত হয়ে ওঠে। এ চেতনাকে খিলাফত আন্দোলন আরও খানিকটা উজ্জীবিত করে তোলে। মুসলিম জাতীয় চেতনার এ প্রবল ঠিকানা দেখেই গান্ধীজি এ খিলাফত আন্দোলনের প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন করেন এবং আন্দোলনের ধারাকে তাঁর পথে ধাবিত করার উদ্দেশ্যেই তিনি যে কাজটি করলেন, তা হলো মীরাটে যে খিলাফত সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়, সেই সম্মেলনে প্রকাশ্য মঞ্চ থেকে গান্ধীজি অসহযোগ আন্দোলনের বাণী সর্বপ্রথম প্রচার করেন। ... এবং দ্বিধাহীনভাবে আমি (মৌলানা আজাদ) তাঁকে সমর্থন করি।' (ভারত স্বাধীন হলো পৃ. ১০)।

মুসলিম মানসে খিলাফতের প্রতি যে বিশ্বাস ও ভালবাসা ও আনুগত্য নিহিত তা গান্ধীজি গভীরভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। এজন্যই তিনি খিলাফতকে মনে করতেন মুসলিম গাভী। আর 'গাভী' সম্পর্কে গান্ধীজির যে বিশ্বাস ছিল, তা তিনি তাঁর `Mother Cow' শীর্ষক এক প্রবন্ধে ব্যক্ত করেছিলেন এই বলে ঃ Mother cow in many way better than the mother who gave us birth .....

Hinduism will live so long as there are Hindus to protect the cow" (The Harijan, Sopt is 1940) See : Hafeez Malik : Moslim Nationalism In India and Pakistan, pp 235, 236) ঃ

গান্ধীজি তাঁর নিজস্ব ধর্মানুরাগিতা ব্যক্ত করতে গিয়ে বলেছেন যে, যতদিন গাভী রক্ষা করার জন্য হিন্দু থাকবে ততদিন হিন্দুধর্মও জিন্দা থাকবে। যদিও শরৎচন্দ্রের ধারণায় 'টিকিয়া থাকাই চরম স্বার্থকতা নয়, অতিকায় হস্তী লোপ পাইয়াছে এবং তেলাপোকা টিকিয়ে আছে' (বিলাসী); তবু একথা বলতে আমরা বাধ্য যে, 'গাভী' তো টিকে আছে কিন্তু খিলাফত কি টিকে আছে? একথা তো বলার অপেক্ষা রাখে না যে, তদানীন্তন খিলাফত আন্দোলন মুসলিম জাতীয় চেতনায় বিপুলভাবে নাড়া দিতে সক্ষম হয়েছিল। এমন কি, তা জামালুদ্দিন আফগানির (১৮৩৮-১৮৯৭) 'প্যান-ইসলামিজম' আন্দোলনের চাইতেও প্রবল ছিল। ভারতীয় বড় বড় নেতারা এবং আলেমরা তখন ঘোষণা দিয়েছিলেন যে, খিলাফত ইসলামের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ, খিলাফত ব্যতীত ইসলাম সচল থাকতে পারে না। মাওলানা আবুল কালাম আজাদ এর কথায় ঃ Who dies without rendering and succor to the Turkish caliph, dies an un-Islamic death". মৌলানা আজাদ এ কথা বলেছিলেন সম্ভবতঃ সেই হাদীসের কথানুসারে যাতে হযরত রসূলুল্লাহ্ (সঃ) বলেছেন ঃ "যে ব্যক্তি যামানার ইমামের হাতে বয়াত না করে ইহলোক ত্যাগ করেছে, সে জাহেলিয়াতে মৃত্যুবরণ করেছে" (মুসলিম)।

তুরস্কের খিলাফতের বৈধতা প্রমাণের জন্য মৌলানা আজাদ বলেছেন যে, মিশরে আব্বাসীয়া খলীফা আল মুতাওয়াক্কিল তাঁর খিলাফতের দাবী ও অধিকারসমূহ ছেড়ে দেন এবং স্বয়ং সুলতান সেলিমের হাতে বয়াত করেন। হাফিয মালিক লিখেছেন, `He (Moulana Azad) believed that when Sultan Selim conquered Syria and Egypt in 1517, the last Abbasid Caliph (at-Mutawakkil in Egypt) ... took an oath of `baiat' at the hands of Sultan Selim, and handed him all the prevelages and powers of the Caliph. In addition to this at Mutawakkil gave Sultan Selim the Kays of the Holy places in Arabia and some belongings of the Prophet Muhammad (SM), such as his standard, sword and swal. Since these the ottoman Sultans have been Caliphs to the world of Islam". (Moslim Nationalism in India and Pakistan, pp. 239, 34)

এছাড়া মাওলানা আজাদ মক্কা'র শরীফ (গভর্ণর) হোসেইনকে তুর্কী খিলাফতের বিরুদ্ধে বাগাওয়াতকারী বা বিদ্রোহী বলে আখ্যায়িত করেছিলেন। আর এরূপ বিদ্রোহ তো ইসলামের দৃষ্টিতে নাজায়েয। তুর্কী খিলাফতের বিরুদ্ধে এই আরব বিদ্রোহ বিজয়ী হয়েছিল জুন ১০, ১৯১৬। বৃটিশদের প্ররোচনায় হোসেইন নিজেকে 'সুলতান' হিসেবে ঘোষণা করেন ১৯১৬ সালেই। এবং ১৯২৪ সালে নিজেকে 'খলীফাতুল মুসলেমীন' হিসেবেও ঘোষণা করেন। উদ্দেশ্য একটাই, এবং তা হচ্ছে মুসলিম মানসপটে খলীফার প্রতি যে আনুগত্য ও আকর্ষণ সেটাকে নিজের প্রতি আকৃষ্ট করা। কিন্তু তা তো হওয়ার ছিল না, হয়ও নি। বরং তিনি আব্দুল আযীয ইবনে সউদের কাছে পরাজিত হয়ে বিতাড়িত হন। (দ্রঃ ফিলিপ কে হিট্টি ঃ হিষ্ট্রী অব দি এরাবস পৃ. ৭৪১)। এই ঘটনায় কিন্তু বৃটিশরা নিরপেক্ষতা অবলম্বন করেছিল কারণ, হোসেন ব্যালফোর ঘোষণার বিরোধিতা করেছিলো।

খিলাফত নেতৃবৃন্দ ঘোষণা দিয়েছিলেন, 'প্রথমে মুসলমান পরে অন্য কিছু'। মওলানা মুহাম্মদ

আলী, মওলানা শওকত আলী, মওলানা আবুল কালম আজাদ প্রমুখ সর্বভারতীয় মুসলিম নেতৃবৃন্দ এক পর্যায়ে ঘোষণা দেন যে, হিন্দুস্থান হচ্ছে দার-উল-হার্ব। সুতরাং মুসলমানদেরকে তাদের ঈমান-আকিদা মোতাবেক জীবনযাপন করার জন্য অন্য কোন ইসলামী দেশে হিজরত করতে হবে। এই আহ্বানে সাড়া দিয়ে হাজার হাজার সরলপ্রাণ মুসলমান হিজরতের উদ্দেশ্যে আফগানিস্তানের পথে যাত্রা করে। তখন এ হিজরত রীতিমত একটা আন্দোলনের রূপ পরিগ্রহ করে। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, পাঞ্জাব, সিন্ধু প্রভৃতি অঞ্চলের মুসলমানরা তাদের সহায়-সম্পত্তি মায় ঘর-বাড়ী পর্যন্ত নাম মাত্র মূল্যে বিক্রী করে দিয়ে খিলাফতের আততাভুক্ত কোন মুসলিম দেশে যাওয়ার উদ্দেশ্যে কাফেলার পর কাফেলা যাত্রা শুরু করে। শুধু মাত্র আগষ্ট মাসেই (১৯২০) অন্ততঃ ১৮,০০০ মুসলমান আফগান সীমান্তে গিয়ে উপনীত হয়। অবস্থা বেগতিক দেখে আফগান সরকার তাদেরকে বাধা দেয় এবং দেশে ফেরৎ পাঠাবার ব্যবস্থা নেয়। এতে করে, মুহাজিরদের স্রোতে ধীরে ধীরে ভাটা পড়ে যায়। কিন্তু দীর্ঘ যাত্রার ধকল সইতে না পেরে অসুস্থ ও বৃদ্ধ নারী-পুরুষ এবং ছোট ছোট ছেলে-মেয়েরা ও শিশুরা পরে মারা পড়ে। পরে যা দেখা গেল, তা হলো পেশোয়ার থেকে কাবুল পর্যন্ত সকল রাস্তার উভয় পার্শ্বে শুধু কবর আর কবরের সারি। এবং এসবই সম্ভব হয়েছিল খিলাফতের নামে, খিলাফত নেতৃবৃন্দের ডাকে। এভাবে আত্ম-কুরবানী দানে উদ্বুদ্ধ করার জন্য মহাত্মা গান্ধীও মুসলিম যুবকদের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানিয়েছিলেন। তিনি তাঁর আত্ম - জীবনীতে লিখেছেন - There (in Aligarh, I invited the young man to be fakirs for the service of the mother land" (Ibid)

১৯২০-এর ১৯শে জানুয়ারীতে সদ্য গঠিত (১৯১৯) খিলাফত কমিটির পক্ষ থেকে ডঃ মুক্তার আহমদ আনসারীর নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধি দল ভারতের ভাইসর এর সাথে সাক্ষাৎ করেন। এই ডেলিগেশন-এর উদ্দেশ্য ছিল, ডাইসরয় বাহাদুরকে তাঁদের খিলাফত সম্পর্কিত বিশ্বাস কি, তা জানিয়ে দেয়া। এবং তাঁদের সেই বিশ্বাসটা ঃ

The continued existence of the Khilafat as a temporal no less than spiritual institution was the very essence of their faith" (Ibid)

অর্থাৎ, প্রতিষ্ঠান হিসেবে খিলাফতের কার্যকর অস্তিত্ব শুধু আত্মিকরূপেই নয়, পার্থিবরূপেও সর্বদা অব্যাহত থাকার বিষয়টি তাঁদের ধর্মীয় আকিদার প্রকৃত মর্ম। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, ধর্মীয় আকিদার সেই মর্মটা কি টিকে আছে? যদি থাকে, এবং থাকারই কথা, তাহলে সেই খিলাফতের সেই সিলসিলা বা ধারাটা এখন কোন্ খাতে প্রবাহিত হচ্ছে?

খিলাফত সম্পর্কে মুসলমানদের উল্লিখিত অপরিহার্য আকীদার কথাটা অবহিত করার জন্য মার্চ মাসে আর একটি ডেলিগেশন গিয়েছিল লন্ডনে বৃটীশ প্রধানমন্ত্রীর কাছে। এ ডেলিগেশনের নেতা ছিলেন মওলানা মুহাম্মদ আলী। এছাড়া, মহামান্য আগা খান ও সৈয়দ আমীর আলী ইসলামী বিশ্বের স্বার্থে খিলাফত রক্ষার প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করে কামাল পাশার নিকটে একটি পত্র লিখেন। তুর্কী পত্র-পত্রিকায় পত্রটি ফলাও করে প্রচার করা হয়। কিন্তু, কামাল এটাকে অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে অবাঞ্ছিত হস্তক্ষেপ বলে মনে করেন। এবং এ অজুহাতে জন সাধারণের মনে খলীফা বিরোধী মনেভাবের সৃষ্টি করতে সক্ষম হন।

দ্রঃ সফিউদ্দীন জোয়ারদার ঃ আধুনিক মধ্যপ্রাচ্য, ১ম খন্ড, পৃ. ২৬৫, ২৬৬)

এই পত্রটি সম্পর্কে অধ্যাপক টয়েনবী লিখেছেন ঃ

"The Premature publication, in the oparation newspapers at Constantinople, of a letter from two iminent Indian Muslims, the Aga Khan and Mr. Ameer Ali, to the Prime Minister of Turkey, intimating in studiously factful language, the distress their the Turkish Great National Assembly, actions had been producing among Muslims abroad, (precipitated the passege by the Turkish Great National Assembly 3rd March 1924, of a law abolishing the Caliphate and banishing the members of the Ottoman Imperial family from the territoris of the Republic of Turkey." (Toynbee : A study of History vol. 7A, p. 25)

অতঃপর তুরস্কে পিপলস্ পাটির এক অধিবেশনে খিলাফত অবসানের পক্ষে চূড়ান্ত প্রস্তাব গৃহীত হয় ২রা মার্চ, ১৯২৪। এবং এ প্রস্তাব পাশ হয় পরদিন, ৩রা মাচ, ১৯২৪ইং তারিখে। প্রকৃত প্রস্তাবে, তুর্কী সুলতানের শাসন কর্তৃত্ব শেষ হয়ে আসে ১৯০৮ সালেই। অতীতের অনেক দিব্য-দৃষ্টির অধিকারী (আহ্লে কাশ্ফ) ওলী আল্লাহ্গণের এরূপ ভবিষ্যদ্বাণী ছিল যে, ইমাম মাহ্দীর আগমনকালে তুর্কী সালতানাতের পরিসমাপ্তি ঘটবে। এ বিষয়ে আলোকপাত করেছেন আল্লামা আলুসী (রাঃ) তাঁর নাশওয়াশ্ শামুল তিস্ সাফরে এলা ইস্তাম্বুল, পুস্তকে পৃঃ ৭৮ (দ্রঃ মওলানা আব্দুল লতীফ বাহাওয়ালপুরী, ফাজেল দেওবন্দ, আল্ বুশরু লিল ইয়ামীন, পৃঃ ৬৪)।

খেলাফত এর অবলুপ্তি ঘোষণায় প্রতিটি মুসলিম দেশের গণমানসে আলোড়ন সৃষ্টি হয়। মুসলমানরা এ ব্যাপারটাকে মুসলিম জাতীয় জীবনে এক মহা দুর্যোগ বলে মনে করে।

কায়রো এবং জেরুজালেমে বিভিন্ন মুসলিম দেশের প্রতিনিধিবৃন্দ সমবেত এবং খিলাফত পুনঃ প্রতিষ্ঠার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করেন। কিন্তু, পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে তাঁদের শেষ উদ্যোগই সফল হয় নি। অতঃপর সমগ্র মুসলিম জাহানে খলীফাতুল মুসলেমীন বলে আর কেউ রইলেন না। অতঃপর ইসলামী বিশ্বের প্রতিটি রাষ্ট্রই বর্তমান যামানার খলীফার স্বীকৃতি ছাড়াই সনদ ছাড়াই চলছে। খলীফার স্বীকৃতি ছাড়া, প্রতাপশালী শক্তিধর বৃটিশ শাসনকেও বৈধ বলে মান্য করতে রাজি ছিল না ভারতের মুসলমানরা। বৃটিশরা চলে গেলে হিন্দু-ভারতের জন্য শাসনকর্তৃত্বের বৈধতার অনুরূপ কোন প্রশ্ন ওঠার কথা ছিল না; কিন্তু মুসলিম পাকিস্তানের জন্যেও কি খলীফাতুল মুসলেমীনের স্বীকৃতির ও সমর্থনের প্রয়োজন ছিল না? আজ তো পৃথিবীর বুকে এমন একটি মুসলিম রাজ্যও নেই, শাসন কর্তৃত্ব খলীফাতুল মুসলেমীন-এর স্বীকৃতি প্রাপ্ত, সনদপ্রাপ্ত। সারা ইতিহাসে তো আমরা দেখেছি যে, খলীফার স্বীকৃতি ছাড়া কোন শাসন-কর্তৃত্বই তা সে সুলতান বা রাজা বাদশাহ্ যে কোন কর্তৃত্বই হোক- বৈধতা পায় নি, জনগণের আনুগত্য পায় নি। তাহলে, আমরা কি বলবো যে, আজকের দুনিয়ার প্রত্যেকটি মুসলিম রাষ্ট্রের শাসন কর্তৃত্ব অবৈধ? নাজায়েয? যদি না বলি, তাহলে স্বীকার করতে হবে যে, পূর্বে খলীফাতুল মুসলেমীনের স্বীকৃতির যে প্রশ্নটা ছিল, সেটাই ছিল আসলে অবৈধ। কিন্তু তা-ও কি হয়? হয় না। কেননা, তাহলে এক্ষেত্রে আমাদের বিরুদ্ধে দাঁড়াবে পবিত্র কুরআন এবং হাদীস ও ইতিহাস ও ঐতিহ্য।

তাহলে মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর শাসনকর্তৃত্বের বৈধতার বর্তমান অবস্থাটা কী? এবং এ ব্যাপারে তাদের ভবিষ্যতের বা কী? অতঃপর বর্তমান পরিস্থিতিতে প্রতিটি মুসলিম রাষ্ট্রের তথা সমগ্র মুসলিম উম্মাহ্ এর করণীয় কী? খেলাফত ও কি সেই সেকুলারিজম এর কৃষ্ণ সাগরে ডুবে যাবে? মানুষ কতটা সেকুলার হতে পারে? বৃটিশ রাজ মুকুটে তো ক্রুশ (+) চিহ্ন স্থাপিত ওদের কারো কারো পতাকায় তো ক্রুশচিহ্নের প্রতীক অঙ্কিত? আমেরিকান ডলারে তো 'খোদার উপরে আস্থা' এর অঙ্গীকার ঘোষিত? সেক্যুলারিজম এর অর্থ তো এটাই হওয়া উচিত যে, প্রত্যেক মানুষের জন্য ধর্মীয় স্বাধীনতা এবং বিবেকের স্বাধীনতা নিশ্চিত করা। প্রত্যেক মানুষকে তার নিজস্ব ধর্ম-বিশ্বাসের অনুশাসন অনুসারে শাসন করা। এবং জবরদস্তি না করা। (চলবে)

- শাহ্ মুস্তাফিজুর রহমান

খতমে নবুওয়ত

মে ২০০৩ মাসিক মদিনা পত্রিকায় মোহাম্মদ আবুল কাশেম ভূঁইয়া লিখিত 'খতমে নবুওয়ত' নামে একটি প্রবন্ধ পাঠ করলাম। লেখক তাঁর গুরুজনের চর্বিত চর্বণ তুলে ধরে হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আঃ) এবং তাঁর প্রতিষ্ঠিত আহমদীয়া মুসলিম জামাতের বিরুদ্ধে নানা প্রকারে মিথ্যা বানোয়াট কথা ও অকথ্য ভাষায় গালি-গালাজ করতঃ সাধারণ মানুষকে উস্কানিমূলক বাক্য দ্বারা বিভ্রান্ত করে আহমদীয়া মুসলিম জামাতের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তোলার অপচেষ্টায় মেতে বেশ বাহাদুরি প্রকাশ করেছেন। অতি সংক্ষেপে এগুলোর উত্তর দেয়া বাঞ্ছনীয় মনে করি ঃ

ভাই আবুল কাশেম ভূঁইয়া! আপনি আপনার প্রবন্ধে আহমদীয়া মুসলিম জামাতের বিরুদ্ধে হিংসাত্মক যে সকল বাক্যবাণ ছুঁড়েছেন এগুলো নতুন কিছুই নয়। আপনার গুরুজনেরা আহমদীয়া জামাতের জন্মলগ্ন থেকেই কাফির প্রতারক মুরতাদ ইত্যাদি ফতোয়াবাজী করে সাধারণ মানুষকে ধোঁকায় ফেলে প্রকৃত সত্যকে জানার বুঝার এবং গ্রহণ করার পথে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করতঃ সাম্প্রদায়িক বিষবাষ্প ছড়িয়ে হযরত রসূল করীম (সঃ)-এর পবিত্র বাণী "আলেমগণ হবে আকাশের নিম্নস্থ সকল সৃষ্ট জীবের মাঝে নিকৃষ্টতম জীব। তারাই ফেৎনা-ফাসাদ সৃষ্টি করবে" (বায়হাকী মিশকাত) - অক্ষরে অক্ষরে পূর্ণ হয়েছে।

ভাই মোহাম্মদ আবুল কাশেম ভূঁইয়া! আপনারা তো আজ একশ' বছরের অধিক কাল যাবত নানাভাবে বিভিন্ন শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে আহমদীয়া মুসলিম জামাতকে দুনিয়ার বুক থেকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়ার চেষ্টায় এমন কোন ছল-বল কলা-কৌশল অবশিষ্ট রাখেন নি যা প্রয়োগ করতে বিন্দু পরিমাণ ত্রুটি করেছেন। জিজ্ঞেস করি, তাতে আপনারা আহমদীয়া মুসলিম জামাতের অগ্রযাত্রাকে কতটুকু রুখতে পেরেছেন? পারেন নি। পারবেনও না। কেননা স্বয়ং আল্লাহ্‌তাআলার হস্তে গড়া আহমদীয়া মুসলিম জামাত। দুনিয়ার কোন শক্তি নেই আহমদীয়া জামাতের অগ্রযাত্রাতে রুখতে পারে। আহমদীয়া মুসলিম জামাতের বিরুদ্ধে দন্ডায়মান হওয়ার অর্থ হিমালয় পর্বতের সাথে মাথা ঠোকা। পবিত্র কুরআন করীমে আল্লাহ্‌তাআলা বলেছেন, "নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌র দলই এমন যে, তারাই বিজয়ী হবে" (সূরা মায়েদা)। সাবধান! শয়তানের দলই ক্ষতিগ্রস্ত" (সূরা মুজাদেলা) "নিশ্চয়ই যালেমগণ কখনও সফলকাম হয় না" (সূরা আনআম)।

আপনারা তো মানবকূল শ্রেষ্ঠ রহমাতুল্লিল আলামীন, খাতামান্নাবীঈন হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা (সঃ)-কে মদীনার মাটির নীচে শুয়িয়ে রেখে আসমানের দিকে তাকিয়ে আছেন কবে নাগাদ খ্রীষ্টানদের নবী ঈসা (আঃ) আসমান থেকে নেমে এসে আপনাদেরকে উদ্ধার করবেন, তারই অপেক্ষায়। আহমদীয়া মুসলিম জামাত আপনাদের মত কাল্পনিক আজগুবি অবাস্তব কেচ্ছা-কাহিনী ও অবান্তর গাল-গল্পে বিশ্বাসী নয়। আহমদীয়া মুসলিম জামাত কাজে কর্মে মন-প্রাণে হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা (সঃ)-কে খাতামান্নাবীঈন বলে বিশ্বাস করে। তাঁর পরে নতুন পুরাতন কোন নবী নেই।

"তাঁরা নিজেদের ধর্মকে খন্ড-বিখন্ড করে নিয়েছে। (এবং বিভিন্ন দল ও উপদলে বিভক্ত হয়ে গেছে)। প্রত্যেক দলই তাদের নিকট যা কিছু আছে তা নিয়ে আনন্দিত। সুতরাং তুমি তাদেরকে কিছু কালের জন্য তাদের ভ্রান্ত বিশ্বাসের মধ্যে ছেড়ে দাও" (সূরা মু'মিনূন)।

হযরত রসূল করীম (সঃ) ইরশাদ করেছেন, "আমার উম্মতের আলেমগণ বনী ইসরাঈলী নবীগণের তুল্য"। ভাই মুহাম্মদ আবুল কাশেম আল্লাহ্‌তাআলার ভয়-ভীতি হৃদয়ে রেখে তাকওয়াশীল হয়ে বিবেকের কষ্টি পাথরে যাচাই করে দেখুন হযরত রসূল করীম (সঃ) উম্মতের আলেমগণকে কত উচ্চ মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত করে গেছেন। আর আপনারা পথভ্রষ্ট হয়ে অজ্ঞানতার অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়ে ঈমান ও আমলের কত নিম্নস্তরে নেমে গিয়ে আসমানের দিকে তাকিয়ে আছেন কবে নাগাদ বনী ইসরাঈলী নবী ঈসা (আঃ) আসমান থেকে নেমে এসে আপনাদেরকে উদ্ধার করবেন। এরূপ ভ্রান্ত বিশ্বাসের মূলোৎপাটন করতঃ সত্য ও সঠিক পথ দেখবার জন্যই মহান আল্লাহ্‌তাআলার প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী সঠিক সময়ে হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আঃ)-কে আখেরী যমানার প্রতিশ্রুত মহাপুরুষ হযরত ইমাম মাহ্‌দী ও মসীহ্ মাওউদ (আঃ)রূপে কাদিয়ানে আবির্ভূত করেছেন।

হযরত রসূল করীম (সঃ)-এর উম্মতের আলমগণ 'ওয়ারেসাতুল আম্বিয়া' নবীর ওয়ারীস অর্থাৎ নায়েবে রসূল। যদ্রূপ আলেমগণ নায়েবে রসূলের দাবীদার তদ্রূপ হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আঃ) নায়েবে রসূল। স্বাধীন, স্বতন্ত্র কোন নবী নন।

ভাই মোহাম্মদ আবুল কাশেম ভূঁইয়া! আপনি আপনার প্রবন্ধে লিখেছেন, খতমে নবুওয়তের সমর্থনে অসংখ্য হাদীস হতে দু'একটি উদ্ধৃতি দেখুন। হযরত আবূ হোরায়রা (রাঃ) বলেন, নবী (সঃ) বলেছেন ঃ আম্বিয়ায়ে কেরামই বনী ইসরাঈলের নেতৃত্ব দিতেন। যখনই কোন নবী ইন্তেকাল করতেন তখনই পরবর্তী নবী তার স্থলাভিষিক্ত হতেন। কিন্তু আমার পর আর কোন নতুন নবী আসবেন না, বরং খলীফাগণ প্রতিনিধিত্ব করবেন এবং তাদের সংখ্যা হবে অনেক (বুখারী, মুসলিম, মুসনাদ আহমদ ও ইবনে মাজাহ)। এ হাদীসে রসূলুল্লাহ্‌র (সঃ) নবুওয়ত রহিত হয়েছে বলেই শেষ করেন নি বরং সাথে সাথেই বলেছেন যে, আর কোন নবী নয় শুধু খলীফাগণ হবেন। আবু দাউদের একটি হাদীসে যে, প্রতি শতাব্দীতে মুজাদ্দেদ বা সংস্কারকরা আবির্ভূত হয়ে দীনের মাঝে যদি কোন কুপ্রথা ঢুকে থাকে তা দূর করবেন। তবু কোন নবী এসে সংস্কার করার কথা তিনি বলেন নি। এতে বোঝা গেল কুসংস্কারাচ্ছন্ন মুসলিম সমাজকে রক্ষার জন্য কোন নবী নয় মুজাদ্দেদগণই যথেষ্ট।" "কোন মুসলমানের নাযাতের জন্য একনিষ্ঠভাবে নামায, রোযা, যাকাত আদায় করা ও খলীফার আনুগত্য করাই যথেষ্ট হবে"।

প্রশ্ন এই যে, হযরত রসূল করীম (সঃ)-এর পবিত্র বাণী অনুযায়ী খিলাফতের সেই খলীফা এবং শতাব্দীর সেই মুজাদ্দেদ বা সংস্কারক কে এবং তিনি কোথায় তাঁর কোন খবর রাখেন কি? যমানার সেই মুজাদ্দেদ বা ইমামকে না মানলে হযরত রসূল করীম (সঃ)-এর কথায় "যে ব্যক্তি যমানার ইমামকে না মেনে মৃত্যু লাভ করবে সে ব্যক্তি জাহেলিয়তের মৃত্যুবরণ করবে" (মুসনাদ, ইমাম আহমদ বিন হাম্বল)

"যে ব্যক্তি যমানার ইমামের হাতে বয়াত না করে ইহলোক ত্যাগ করেছে, সে ব্যক্তি জাহেলিয়তের মৃত্যু লাভ করেছে" (সহী মুসলিম)। হযরত রসূল করীম (সঃ)-এর পবিত্র বাণী থেকে প্রমাণিত হ'ল যে, যে ব্যক্তি যমানার ইমামকে না মেনে মৃত্যু লাভ করবে তাঁর মৃত্যু জাহেলিয়তের। তিনি যতো বড় বিদ্বান, যত বড় আলেম ওলামা মুফতী মাওলানা আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন ইসলামিক চিন্তাবিদের দাবীদারই হউন না কেন, যমানার ইমামের হাতে বয়াত না করে মৃত্যুবরণ করলে তার মৃত্যু জাহেলিয়তের। ভাই আবুল কাশেম ভূঁইয়া! আপনার প্রবন্ধ পাঠে তো মনে হয় যে, আপনি একজন ইসলামিক চিন্তাবিদ। আপনি কি যমানার খলীফা, মুজাদ্দেদ বা ইমামকে মেনেছেন?

হযরত রসূল করীম (সঃ)-এর পবিত্র বাণীকে অমান্য অগ্রাহ্য ও অস্বীকার করার অর্থ স্বয়ং হযরত রসূল করীম (সঃ)-কে অমান্য ও অস্বীকার করা। আপনি যদি যুগ-ইমামকে মেনে না থাকেন তাহলে একথা কি বলা যায় না যে, আপনি হযরত রসূল করীম (সঃ)-কে অমান্য ও অস্বীকার করতঃ নিজে যেমন পথ ভ্রষ্ট হয়েছেন তদ্রূপভাবেই সাধারণ মানুষকে ধোঁকা দিয়ে অন্ধকার পংক্কিলে ঠেলে দিচ্ছেন? কেননা এক অন্ধ আরেক অন্ধকে কখনও পথ দেখাতে পারে না। রাগ করবেন না। সত্য কথা বললে তো আপনারা আবার তেলে বেগুনে জ্বলে ওঠেন। আপনাদের ঈমান শুধু মৌখিকভাবে পত্র-পত্রিকায়, বই-পুস্তকে অর্থাৎ কিতাবের মাঝেই সীমাবদ্ধ। বাস্তবে কাজে কর্মে এর কোন প্রমাণ নেই। আপনারা মুখে যা বলেন কাজে তা করেন না। মুখে বলেন, খলীফার আনুগত্য করে চলতে হবে। যামানার মুজাদ্দেদ বা ইমামকে মেনে চলতে হবে। কিন্তু বাস্তবে তা করেন না। মুখে যা বলেন কাজে করেন তাঁর উল্টো। তাই আল্লাহ্‌তাআলা বলেছেন, "হে ইমানদারগণ! যারা ঈমান এনেছো, তোমরা কেন তা বল যা কর না? আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে এটা অত্যন্ত ঘৃণিত যে, তোমরা তা বল যা কর না" (সূরা আস্ সাফ্‌ফ)।

ভাই মোহাম্মদ আবুল কাশেম ভূঁইয়া! হযরত রসূল করীম (সঃ)-এর পবিত্র বাণী যা আপনি নিজেই প্রবন্ধে তুলে ধরেছেন, আহমদীয়া মুসলিম জামাতের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ রটিয়ে মরা ভাইয়ের পচা মাংসভক্ষণ করার চেষ্টায় রত না হয়ে আল্লাহ্‌তাআলার ভয় হৃদয়ে রেখে এগুলোকে নিয়ে একটু হৃদয়ঙ্গম করে দেখুন আপনারা ঈমান হারা হয়ে অধঃপতনের কত নিম্নস্তরে চলে গেছেন। আপনি আহমদীয়া মুসলিম জামাতকে কাদিয়ানী ধর্মাবলম্বী বলেছেন, এটা আপনার জাজ্বল্যমান ডাহা মিথ্যা কথা। হিংসা-বিদ্বেষের বশবর্তী হয়ে আপনারা ঈমান হারা অবস্থায় এমনি নিম্নস্তরে নেমে গেছেন যে, মিথ্যা কথা বলা যে মহাপাপ একথাটাও বেমালুম ভুলে গেছেন। মিথ্যা কথা বলতে আল্লাহ্‌তাআলার ভয়ে আপনাদের অন্তর কখনও কেঁপে ওঠে না। কারণ হিংসা-বিদ্বেষ নামক বিষে আপনাদের অন্তরকে খেয়ে জর্জরিত করে ফেলেছে। যেখানে আর আলো প্রবেশ লাভ করতে পারছে না।

কাদিয়ানী কোন ধর্মমত কোন সম্প্রদায় অথবা কোন দলের নাম নয়। কাদিয়ান একটি স্থানের নাম। যেহেতু মুসলমান জাতি আজ আত্মিক নৈতিক সকল দিক দিয়ে সকল জাতির কাছে লজ্জিত অপমানিত অবহেলিত, নেই কোন নেতা নেই একতা নেই ভ্রাতৃত্ববোধ ও সংহতি এ অবস্থায় আল্লাহ্‌তাআলার প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আঃ)-কে আখেরী যমানার প্রতিশ্রুত মহাপুরুষ হযরত ইমাম মাহ্‌দী ও মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-রূপে কাদিয়ানে আবির্ভূত করলেন। মুসলমান জাতির মাঝে সক্রিয়ভাবে কোন জামাত ছিল না। তিনি আহমদীয়া মুসলিম জামাত নামে ঐশী-নির্দেশে এক সংগঠন স্থাপন করলেন। বর্তমানকালে একমাত্র আহমদীয়া মুসলিম জামাতই বিশ্বের প্রান্তে প্রান্তে ইসলামের প্রচার ও প্রসারকল্পে অহোরাত্র নিমগ্ন।

ভাই মোহাম্মদ আবুল কাশেম ভূঁইয়া! আপনি বলেছেন, আহমদীগণ নাকি কুরআন হাদীসের ভুল ও অশুদ্ধ অনুবাদ করে; কিন্তু কুরআন করীমের কোন কোন আয়াতের ভুল ও অশুদ্ধ অনুবাদ করেছে তা উল্লেখ করেন নি। তবে আপনারা যেমন ত্রিত্ববাদী খ্রীষ্টানদের সাথে বুকে বুক দিয়ে হাতে হাত মিলিয়ে পবিত্র কুরআন করীমের আয়াতের অনুবাদ করেন যে, হযরত ঈসা (আঃ)-কে আল্লাহ্‌তাআলা সশরীরে আসমানে তাঁর নিকটে তুলে নিয়েছেন তিনি আবার হযরত রসূল করীম (সঃ) খাতামান্নাবীঈন হওয়া সত্ত্বেও আসমান থেকে নেমে এসে হযরত রসূলে করীম (সঃ)-এরই উম্মতগণকে উদ্ধার করবেন তাতে খাতামান্নাবীঈন হযরত রসূল করীম (সঃ)-এর কোন অমর্যাদা হবে না। আপনাদের এরূপ ত্রিত্ববাদী খৃষ্টানি আকিদা, কাল্পনিক উদ্ভট অবাস্তব কল্পকাহিনীতে আহমদীগণ বিশ্বাসী নয়। হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আঃ) ঐশী-নির্দেশক্রমে আপনাদের এরূপ ভ্রান্ত বিশ্বাসের মূলোৎপাটন করে হযরত ঈসা (আঃ)-এর মৃত্যু প্রমাণ করতঃ কাশ্মীরে তাঁর কবর দেখিয়ে এরূপ ক্রুশীয় বিশ্বাসকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে ধূলি-বালির সাথে মিশিয়ে দিয়েছেন। হাদীস গ্রন্থে এটাকেই বলা হয়েছে হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ) আগমন করতঃ ক্রুশ ধ্বংস করবেন অর্থাৎ ক্রুশীয় মতবাদের বিলাপ সাধন করবেন।

পরিশেষে বলতে চাই, হে ভাই মোহাম্মদ আবুল কাশেম ভূঁইয়া! দলমত নির্বিশেষে সকলই ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)-এর আগমনে বিশ্বাসী। কোনকালেই আল্লাহ্‌র প্রেরিত কোন মহাপুরুষ আলেম ওলামা মুফতী মওলানাগণের খেয়াল খুশিমত আগমন করেন নি। ভবিষ্যতেও করবে না। তাহলে ঈমানের কোন মূল্যই থাকে না। হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আঃ) আখেরী যামানার প্রতিশ্রুত মহাপুরুষ হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)-এর দাবী করেছেন। যদি তিনি সত্যবাদী হন, নিশ্চয়ই তিনি সত্যবাদী, বিরোধিতা করে কোন লাভ হবে না। কেননা এটা আল্লাহ্‌তাআলার কাজ। আল্লাহ্‌তাআলার ভয় হৃদয়ে রেখে অন্তরে জমাকৃত বিষ বাষ্পকে ধুয়ে মুছে দূরে নিক্ষেপ করতঃ নির্মল নিষ্কলুষ ও পবিত্র অন্তরে হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আঃ)-এর সত্যতা যাচাই-এর কাজে লেগে যান। বর্তমান বিশ্ব পরিস্থিতি মুসলমান জাতির করুণ অবস্থা একবার লক্ষ্য করুন, কেন মুসলমানগণের এহেন দূরবস্থা আল্লাহ্ ও রসূল করীম (সঃ)-এর নির্দেশাবলীকে অমান্য অগ্রাহ্য ও অস্বীকার করার কারণে নয় কী? যতদিন পর্যন্ত মুসলমানগণ আল্লাহ্‌র প্রেরিত মহাপুরুষ হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)-কে গ্রহণ করে না নিবে ততদিন পর্যন্ত তাদের লাঞ্ছনা-গঞ্জনার দুঃখ-দুর্দশার অবসান হবে না একথা জোর দিয়ে বলা যায়।

- সরফরাজ এম, এ, সাত্তার রঙ্গু চৌধুরী

(৪র্থ কিস্তি)

এসো কুরআন শিখি

আয়াত নং ২৫

শব্দার্থ ঃ ফা-ইন- কিন্তু যদি, **লাম তাফআলূ** - তোমরা (এরূপ) করতে না পার, **ওয়া লান তাফআলূ** - আর তোমরা (এরূপ) কখনই করতে পারবে না, **ফাত্তাকূ** - তাহলে তোমরা ভয় কর, **আন্নার** - সেই আগুন, **আল্লাতী** - যা, **ওয়াকূদুহা** - এবং যার জ্বালানী, **আন্নাস** - মানুষ, **ওয়াল হিজারাহ্** - এবং পাথর, **উইদ্দাত্** - প্রস্তুত রাখা হয়েছে, **লিলকাফিরীন** - কাফির বা অস্বীকারকারীদের জন্যে।

অনুবাদ ঃ কিন্তু তোমরা যদি (এরূপ) করতে না পার এবং তোমরা কখনই (এরূপ) করতে পারবে না, তাহলে সেই আগুনকে ভয় কর, যার জ্বালানী হলো মানুষ ও পাথর, যা কাফিরদের জন্যে প্রস্তুত রাখা হয়েছে।

আয়াত নং ২৬

শব্দার্থ ঃ ওয়া বাশ্‌শির- এবং তুমি সুসংবাদ দাও, **আল্লাযীনা আমানূ** - যারা ঈমান এনেছে, **ওয়া 'আমিলুস্ সলিহাতি** - এবং (সময়োপযোগী) সৎকাজ করেছে, **আন্নালাহুম** - নিশ্চয় তাদের জন্যে রয়েছে, **জান্নাতিন** - এমন সব জান্নাত বা বাগান, **তাজরী** - বয়ে যায়, **মিন তাহতিহা** - এর পাদদেশ দিয়ে, **আল্ আনহার** - নদ-নদী, **কুল্লামা** - যখনই, **রুযিকূ** - রিয্ক দেয়া হবে, **মিনহা** - তা থেকে, **মিন ছামারা-তিন** - ফল-ফলাদি থেকে, **রিযক্বান** - রিয্কস্বরূপ, **ক্বালূ** - তারা বলবে, **হাযা** - এতো, **আল্লাযী** - সেই, **রুযিক্বনা** - আমাদেরকে রিয্ক দেয়া হয়েছিল, **মিন ক্বাবলু** - এর পূর্বেও, **ওয়া উতূ বিহী** - অথচ তাদেরকে দেয়া হয়েছিল, **মুতাশাবিহান** - কেবল এর অনুরূপ, **ওয়া লাহুম** - এবং তাদের জন্যে, **ফীহা** - সেখানে, **আযওয়াজুন** - সঙ্গীরা, **মুত্বাহ্‌রাতুন** - পবিত্রকৃত, **ওয়া হুম** - এবং তারা, **ফীহা খলিদূন** - সেখানে চিরকাল বাস করবে।

অনুবাদ - এবং যারা ঈমান এনেছে ও সৎকাজ করেছে তুমি তাদেরকে সুসংবাদ দাও, নিশ্চয় তাদের জন্যে এমনসব বাগান রয়েছে যার পাদদেশে দিয়ে নদ-নদী বয়ে যায়, যখনই তা থেকে তাদেরকে রিয্কস্বরূপ কিছু ফল-ফলাদি দেয়া হবে, তারা বলবে, এতো সেই রিয্ক যা আমাদেরকে এর পূর্বেও দেয়া হয়েছিল, অথচ তাদেরকে কেবল এর অনুরূপ (রিয্ক) দেয়া হয়েছিল, আর তাদের জন্যে সেখানে পবিত্রকৃত সঙ্গীরা থাকবে এবং সেখানে তারা চিরকাল বাস করবে।

আয়াত নং ২৭

শব্দার্থ ঃ ইন্নালাহা- নিশ্চয় আল্লাহ্, **লাইয়াস্ তাহ্ঈ** - লজ্জাবোধ করেন না, **আঁ ইয়াযরিবা মাছালান** - কোন দৃষ্টান্ত দিতে, **মা বা'উযাতান** - কোন মশা, **ফামা ফাওক্বাহা** - অথবা এর চেয়ে ছোট, (এ দুটো শব্দের অর্থ - অথবা মশা যা বহন করেও হতে পারে। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (রাহেঃ) এ অর্থ করেছেন। এতে ডেঙ্গু রোগের জীবাণু বাহক মশার ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে)। **ফা আম্মাল্লাযীনা** - অতএব যারা, **আমানূ** - ঈমান এনেছে, **ফাইয়া'লামূনা** - তারা তো জানে, **আন্নাহু** - নিশ্চয় এটা। **আল্ হাক্কু** - ধ্রুব-সত্য, **মিররব্বিহিম** - তাদের প্রভু-প্রতিপালকের পক্ষ থেকে, **ওয়া আম্মাল্লাযীনা কাফারূ** - আর যারা কুফরী বা অস্বীকার করেছে, **ফাইয়া'কূলূনা** - তারা বলে, **মাযা** - কী, **আরাদাল্লাহু** - আল্লাহ্ ইচ্ছা করেন বা চান, **বিহাযা মাছালান** - এরূপ দৃষ্টান্ত দিয়ে, (তিলাওয়াতের সময় এখানে ওয়াকফে লাযিম হওয়ায় থামতে হবে), **ইউযিল্লু বিহী** - এর দ্বারা পথভ্রষ্ট সাব্যস্ত করেন, **কাছীরান** - অনেককে, **ওয়া ইয়াহ্‌দী বিহী** - এবং এর দ্বারা হেদায়াত দেন, **ওয়ামা ইউযিল্লু** - আর তিনি পথভ্রষ্ট সাব্যস্ত করেন না, **বিহী** - এর দ্বারা, **ইল্লাল ফাসিক্বীন** - দুষ্কর্মকারীরা ছাড়া।

অনুবাদ - আল্লাহ্ কখনও কোন মশা বা এর চেয়েও ক্ষুদ্র কোন দৃষ্টান্ত দিতে লজ্জাবোধ করেন না, অতএব যারা ঈমান এনেছে তারা জানে, নিশ্চয় এটা তাদের প্রভু-প্রতিপালকের পক্ষ থেকে ধ্রুব সত্য, কিন্তু যারা অস্বীকার করেছে তারা বলে, 'এরূপ দৃষ্টান্ত দিয়ে আল্লাহ্ কী বুঝাতে চান? এর দ্বারা তিনি অনেককে পথভ্রষ্ট সাব্যস্ত করেন এবং অনেককে তিনি এর দ্বারা হেদায়াত দেন, আর তিনি এর মাধ্যমে দুষ্কর্মকারীদেরকে ছাড়া অন্য কাউকেই পথভ্রষ্ট সাব্যস্ত করেন না।

আয়াত নং ২৮

শব্দার্থ ঃ আল্লাযীনা ইয়ানকুযূনা - যারা ভঙ্গ করে, **আহদাল্লাহি** - আল্লাহ্‌র অঙ্গীকার, **মিন্ বা'দি** - এর পর, **মীছা'ক্বিহী** - তা সুদৃঢ় করা, **ওয়া ইয়াকুত্ব'উনা** - এবং ছিন্ন করে, **মা আমারাল্লাহু** - আল্লাহ্ যার আদেশ দিয়েছেন, **বিহী** - সে সম্বন্ধে, **আঁইউসালা** - যেন অটুট রাখে, **ওয়া ইউফসিদূনা** - এবং বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে, **ফিল আরযি** - দেশে বা পৃথিবীতে, **উলা-ইকা** - এরা, **হুমুল খসীরূন** - এরাই ক্ষতিগ্রস্ত।

অনুবাদ - যারা আল্লাহ্‌র অঙ্গীকারকে সুদৃঢ় করার পরও তা ভঙ্গ করে এবং যে সম্পর্ককে অটুট রাখতে আল্লাহ্ আদেশ দিয়েছেন তা ছিন্ন করে এবং পৃথিবীতে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে এরাই ক্ষতিগ্রস্ত।

আয়াত নং ২৯

শব্দার্থ ঃ কায়ফা- কীভাবে, **তাকফুরূনা** - তোমরা অস্বীকার করতে পার, **বিল্লাহি** - আল্লাহ্‌কে, **ওয়া কুনতুম** - অথচ তোমরা ছিলে, **আমওয়াতান** - প্রাণহীন, **ফা আহ্‌ইয়াকুম** - এরপর তিনি তোমাদেরকে জীবন দান করলেন, **ছুম্মা ইউমীতুকুম** - আবার তিনি তোমাদেরকে মৃত্যু দিবেন, **ছুম্মা ইউহ্‌ঈকুম** - পুনরায় তিনি তোমাদেরকে জীবিত করবেন, **ছুম্মা ইলায়হি তুরজা'উন** -এরপর তাঁরই দিকে তোমাদেরকে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে।

অনুবাদ ঃ তেমরা কীভাবে আল্লাহ্‌কে অস্বীকার করতে পার? অথচ তোমরা ছিলে প্রাণহীন, এরপর তিনি তোমাদেরকে জীবন দান করলেন, আবার তিনি তোমাদেরকে মৃত্যু দিবেন, পুনরায় তিনি তোমাদেরকে জীবিত করবেন, এরপর তাঁরই দিকে তোমাদেরকে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে।

আয়াত নং ৩০

শব্দার্থ ঃ হুয়াল্লাযী- তিনিই সেই সত্তা, **খলাক্বালাকুম** - তোমাদের জন্যে সৃষ্টি করেছেন, **মা ফিল আরযি** - পৃথিবীতে যা আছে, **জামী'আন** - সব কিছু, **ছুম্মাস্‌তাওয়া** - এর পর তিনি মনোনিবেশ করলেন, **ইলাস্ সামাই** - আকাশের দিকে, **ফাসাব্বাহুনা** - এবং একে সুবিন্যস্ত করলেন, **সাব'আ সামাওয়া-তিন** - সাত আকাশে, **ওয়া হুয়া** - আর তিনি, **বিকুল্লি শায়ইন** - প্রত্যেক বিষয়ে, **'আলীমা** - সর্বজ্ঞ।

অনুবাদ ঃ তিনিই সেই সত্তা যিনি পৃথিবীতে যা কিছু আছে এর সবই তোমাদের জন্যে সৃষ্টি করেছেন। এরপর তিনি আকাশের দিকে মনোনিবেশ করলেন এবং একে সাত আকাশে সুবিন্যস্ত করলেন আর তিনি প্রত্যেক বিষয়ে সর্বজ্ঞ। (৩য় রুকূ শেষ) (চলবে)

সংকলন - **মোহাম্মাদ মুতিউর রহমান**

সেই চল্লিশজন

১৮৮৯ সালের ২৩শে মার্চ লুধিয়ানা শহরে হযরত মসীহেজ্জামান (আঃ)-এর হাতে হাত রেখে যে চল্লিশজন সেদিন মর্ত্যকে স্বর্গ বানানোর অঙ্গীকার করেছিলেন, তাঁদের কে কেমন আছেন এবং কোথায় আছেন এর বিষদ বিবরণ হয়ত আমার জানা নেই, তবে তাঁরা যে স্বর্গ-সুখে সুখী আছেন একথা অনিবার্য সত্য। সেই চল্লিশজনারই একজন সেদিন অর্থাৎ ১৯০৮ সালের ২৭শে মে ইসলাম সেবার খাতিরে শির উচিয়ে 'কুদরতে সানীয়া" বাস্তবায়নের দায়িত্ব নিয়েছিলেন। হে ধর্মবীর নূর উদ্দীন (রাঃ)! তোমার উপর স্বর্গের সকল শান্তি বর্ষিত হোক, নব জাতক আহমদীয়া জামাতকে তুমি তোমার কাঁধে বহে পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে পৌছে দেয়ার ব্যাপারে যে মহান দায়িত্ব পালন করেছ এর জন্য এ জামাতের নর-নারী প্রতিটি আহমদী আজ তোমার এ নিষ্ঠাপূর্ণ সেবার সমীপে একান্তভাবে কৃতজ্ঞ। তুমি আজ নেই বটে, কিন্তু তোমার পুণ্যময় অস্তিত্ব আহমদী প্রতিটি আলয়ে আলয়ে সূর্যসম দিপ্তীময়।

মানুষ মাত্রই মরণশীল। এলাহীর এ বিধান চক্রের আবর্তে পড়ে সেই মহান ব্যক্তিত্ব মাত্র ছয় বছরকাল তাঁর দায়িত্বপদে আসীন থেকে নশ্বর জগত হতে প্রয়াত হলেন। সালটি ছিল ১৯১৪। অতঃপর সর্বশক্তিমান খোদার পবিত্র ব্যবস্থাপনার রায়ে এ গুরুত্বপূর্ণ কর্মের দায়িত্বভার অর্পিত হলো ২৫ বছরের এক সাধু যুবকের স্কন্ধে। তিনি ছিলেন স্বর্গ স্বীকৃত মুসলেহ মাওউদ, যাঁর সম্পর্কে স্বয়ং খোদার উক্তি হলো, "যদি কোন সাম্রাজ্য তার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায় অথবা কোন রাষ্ট্র তার মোকাবেলা করে তবে একে ছিন্ন ভিন্ন করে দেয়া হবে। সে হবে পৃথিবীর বন্দীগণের মুক্তির কারণ।" ধর্ম বিষয়ে তাঁর অসাধারণ পান্ডিত্য, বাগ্মিতা শক্তি ও লেখনী প্রজ্ঞা বলে তিনি তাঁর প্রিয় এ জামাতকে বিজয়ের শীর্ষে উন্নীত করে রেখে গেছেন। তিনি তাঁর খোদার সাহায্যপুষ্ট হয়ে স্বীয় জোর সাধনায় আসমান ও জমিনকে কাঁপিয়ে তুলে মাহ্দী (আঃ)-প্রদত্ত বাণীকে সকল ধর্মের সকল জনার শীর্ষে প্রতিষ্ঠিত করে গেছেন। তিনি পৃথিবীর আলো বাতাসের কাছে এ উক্তিই রেখে গেছেন যে, ইসলাম ছাড়া আর বাকি সবধর্মই মরজগত থেকে অসহায় হয়ে বিদায় নিবে। তাঁর কর্মজীবন সময়ে যদিও বা কয়েক হতভাগা তাঁর বিপক্ষে দাঁড়িয়েছিল তাদের সবাই লাঞ্ছনার সাথে পৃথিবী থেকে করুণভাবে বিদায় নিয়েছে, এমনটিই হবে। কারণ পাহাড় কখনও কোন টিলার আঘাতে নড়ে না বরং টিলা খন্ডটিই চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যায়। পরিণামে তা-ই হয়।

খোদার প্রেক্ষিতে ধর্মজগতের সেই আধ্যাত্মিক সিংহ সুদীর্ঘ অর্ধশতাব্দীকাল ধরে এ জামাতের সাগরসম সেবা প্রদান করে আমাদের কাছ থেকে চির বিদায় নিলেন। হে আমাদের প্রভু! তুমিই এ আত্মাসমূহের হেফাযতকারী হও। স্বর্গাকাশের সিদ্ধান্ত মতে এ মহান কর্মের মহাদায়িত্ব অতঃপর ন্যস্ত হলো হযরত মসীহে মাওউদ (আঃ)-এর সুযোগ্য বংশধর হযরত হাফেয মির্যা নাসের আহমদ (রাহেঃ)-এর শিরোপরে। তিনিও ঠিক সেই একই গতিময়তার ছন্দে নজীর বিহীন ধর্ম সাধনার দ্বারা খোদাপ্রদত্ত পুণ্যময় এ দায়িত্ব সমাপনান্তে ক্লান্তিহীন চেষ্টা করে গেছেন। দেশ-বিদেশ ভ্রমণ করে রাজা রাজন্যবর্গের সাথে সাক্ষাৎ করে তাদেরকে এ স্বর্গ সত্যকে যেচে নেয়ার নিমিত্তে মিনতি ভরা নিবেদন করে গেছেন। অতঃপর তিনিও তাঁর পরম প্রিয়ের স্নেহের ডাকে সাড়া দিয়ে ঠিক তাঁদেরই মতো জগত-মায়া ছেড়ে পাড়ি দিলেন ওপার জীবনে। কিন্তু অলৌকিক বিষয় এটাই যে, জগত তাঁর মশহুর নামটিকে আদৌ ভুলতে পারে নি। তাই পুণ্যশূন্য জগত বাদশাহ্ নরাধম জিয়াউল হক মির্যা তাহেরকে আটক করার আদেশ দেয়ার স্থলে শেষটায় কিনা আদেশ করলেন সেই স্বর্গ-নন্দিত মির্যা নাসেরকে আটক করার জন্য। অর্থাৎ তার স্মরণ পট হতে তখনও সে ওই পুণ্যময় নামটিকে মুছে ফেলতে পারে নি। আসলে খোদার আরশ যাঁকে ভুলে না জগত তাঁকে ভুলে কীভাবে? পরিশেষে তা-ই হয়েছে, যা খোদা ইচ্ছা করেছেন। আকাশ পাড়ি দিয়ে নিজ নিলয়ে নিরাপদে চলে গেলেন মসীহ্র প্রতিনিধি আর সেই আকাশ পথেই নিঃশেষ হলেন মানব প্রতিনিধি। এখানে এ ঘটনার আর অধিক বলার প্রয়োজন নেই। তার জন্য ইতিহাসই যথেষ্ট। যেহেতু এ ভুলের পরও এ বেহুশ নির্বোধের আর হুশ হলো না। সেহেতু সে তার সঠিক প্রাপ্যই পেয়েছে। এই প্রেক্ষিতেই কবি গেয়েছেন-

কি ঘুম তুই ঘুমিয়ে ছিলি হতভাগিনী
এত ডাকলাম তবু তোর ঘুম ভাঙ্গেনি॥

এমনিভাবে এ জামাত বহু ঘটনা ও দুর্ঘটনার মাঝ দিয়ে শেষটায় খিলাফতের ৪র্থ অধ্যায়ে এসে উপনীত হলো আর এর দায়িত্ব অর্পিত হলো ৪র্থ খলীফা হযরত মির্যা তাহের আহমদ (রাহেঃ)-এর কাঁধে। তাঁর খিলাফতের দ্বিতীয় বছরই তাঁকে তাঁর প্রিয় মাতৃভূমি ছেড়ে ত্রিত্ববাদের ঘাঁটি লন্ডন যেতে হয়েছে। আমাদের একটি প্রবাদ বাক্য হলো, "যে শিশুর মুখ ফুটেছে সে অন্ধকারেও বলে।" অনুরূপভাবে তিনিও ঠিক একই জায়গায় শুরু করলেন অনুরূপ কর্ম। ত্রিত্ববাদের মাটিতে স্বীয় আসন গেড়ে তাদেরই নাকের ডগায় এম, টি,-এ এর মাধ্যমে তাদের নবী হযরত ঈসা (আঃ)-কে মৃত্যু ঘোষণা করে পৃথিবীর পঞ্চ মহাদেশ ব্যাপী শুরু করলেন জিন্দা ইসলামের জিন্দা প্রচার। সাথে চালু করলেন ওয়াকফে নও নামক এক অনন্য সাধারণ পুণ্যময় পরিকল্পনা। আরবী, বাংলা, উর্দূ, ইংরেজি, ফ্রান্স, ইতালী, ইন্দোনেশিয়ান, জার্মানী, ইত্যাদি বহুবিধ ভাষার সমন্বয়ে তিনি পাঠাতে লাগলেন ইসলামের সওগাত প্রতিটি বিধর্মীর ঘরে দ্বারে। আফ্রিকার জঙ্গল, আরবের মরুভূমি, এশিয়ার পাহাড় আর মেরুদ্বয়ের বরফ দেশ থেকে উত্থিত হলো নবী শ্রেষ্ঠের শ্রেষ্ঠবাণী "লা শারীক আল্লাহ্"। পরিশেষে প্রায় বিশ কোটি ধর্মপ্রাণ মহাজন 'লাব্বায়েক' বলে সমবেত হলেন এ পুণ্যবান নেতার ছত্রছায়ায়।

কিন্তু ১৯শে এপ্রিল তারিখের বিকাল বেলায় অবগত হলাম, পৃথিবীর এ শ্রেষ্ঠ মানুষটি সবার অগোচরে সংগোপনে ধরার মায়া ছেড়ে স্বর্গ ডাকে সাড়া দিয়ে চলে গেলেন খোদার ক্রোড়ে। হায়, একি হলো! রুদ্ধশ্বাসে দৌড় দিলাম ৪নং বকশী বাজারের উদ্দেশ্যে। প্রাঙ্গণে ঢুকতেই দেখি, গাড়ীর চাকাগুলো যেন নড়ছে না, উঠানের বালি যেন ভাসছে না, মানুষের চোখগুলো যেন পাতি নাড়ছে না। কেবলই ফেল ফেল চাহনি

আর নয়ন ভরা জল। সবই নির্বাক আর নিষ্কণ্ঠ। সবার মনেই এক প্রশ্ন, 'একি হলো কি করে হলো এবং কেন হলো' কিছুই তো জানলাম না এবং কিছুই তো শুনলাম না, দোয়া করারওত সুযোগ পেলাম না। মসজিদে দাঁড়িয়ে জনাব আব্দুল আযীয সাদেক, সদর মুরব্বী বললেন, "বর্তমান এ পরিস্থিতি জামাতের জন্য এক প্রলয়ংকারী ভূমিকম্পস্বরূপ সুতরাং এখন কেবল দোয়া করাই আমাদের একমাত্র কাজ।' মুরব্বী সিলসিলা জনাব আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী সে প্রখ্যাত কিতাব আল্ ওসীয়তের কিয়দংশ পাঠ করে শ্বাসরুদ্ধ কণ্ঠে বললেন, খোদার অভিপ্রায় এটাই যে, আপনারা সর্বাবস্থায় ধৈর্য ধারণ করুন। আপাততঃ নেযামের সাথে আমাদের সম্পর্কের যে শূন্যতার সৃষ্টি হয়েছে তা যেন তিনি যথারীতি যথাশীঘ্র পুনঃ স্থাপন করেন। তার জন্য দোয়া করতে থাকুন।" সদ্য নিযুক্ত শ্রদ্ধেয় ন্যাশনাল আমীর সাহেব শুধু এটুকুই বললেন, "হে বন্ধুগণ! আপনারা কেবলই কাঁদুন, গোপনে কাঁদুন, প্রকাশ্যে কাঁদুন মসজিদে বসে গৃহের কোণে বসে বসে ক্রন্দন করুন। রোজা রাখুন, সদকা দিন। (সাথে সাথেই টাকা জমা হতে লাগল)। স্বামী-স্ত্রীতে মিলে, ছেলে-মেয়ে নিয়ে সিজদায় রত হয়ে কাঁদুন, খোদা কখনও এমনটি করেন না যে, তিনি তাঁর আপন বান্দাদের একলা রেখে চলে যান। সুতরাং আমরা অবশ্যই সফলকাম হবো। শুনলাম গোটা ২ দিনের মধ্যেই প্রায় বিশ হাজার পুণ্যপ্রাণ আহমদী লন্ডনের টিলফোর্ডে এসে হাজির হয়েছেন। যাদের মনে সেই একই প্রশ্ন, একই জিজ্ঞাসা এবং একই আকুতি, হায়, একি হলো!

২২শে এপ্রিল, অবশেষে অবসান হলো সকল উৎকণ্ঠা আর সকল আতঙ্কের। মসজিদে ফযল থেকে ঘোষণা দেয়া হলো যে, নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া জামাতের ৫ম খলীফা নির্বাচিত হলেন কৃষি বিষয়ক বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ডিগ্রীধারী হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আইঃ)। আজ হতে শত বছর পূর্বে যাঁর সম্পর্কে যুগ-ইমাম হযরত মসীহে মাওউদ (আঃ)-এর প্রাপ্ত ইলহাম ছিল, "হে মাসরূর! আমি তোমার সাথে আছি।" ঘোষণা মাত্রই তাঁর শিরে পরানো হলো খলীফা রাবে' (রাহেঃ)-এর ব্যবহৃত শুভ্র পাগড়ী, আঙ্গুলে পড়ানো হলো সেই আংটি আর গায়ে জড়ানো হলো হযরত মসীহে মাওউদ (আঃ)-এর রেখে যাওয়া ঐতিহ্যবাহী সেরোয়ানী। সাথে সাথেই যেন আকাশ-বাতাস ফিরে পেলো এর স্বাভাবিক পরিবেশ, ক্রন্দন থেকে অব্যাহতি পেল প্রতিটি আহমদী পরিবার। প্রশান্তির হাসিতে উৎফুল্ল হলো খোলা আকাশের নীচে দাঁড়ানো হাজার হাজার পুণ্যপ্রাণ আহমদী সৈনিক। শব্দমান হয়ে উঠলো প্রত্যেকের না বলা মনের কথা, "হ্যাঁ, যা চেয়েছিলাম তা-ই যেন পেয়ে গেলাম।"

হে প্রিয় পাঠক! পরিতাপ এটাই যে, পৃথিবীর প্রতিটি জাতির প্রতিটি সংস্থা কিংবা প্রতিটি সংঘ ও দলেরই একজন নেতা আছেন। এমন কি পশু-পাখী দলেরও নেতা আছে। কিন্তু নেতা নেই কেবল ধর্মের যা দিগ্বিদিক ছুটা মানুষের জন্য একান্ত প্রয়োজন। তবে ইসলামের সংস্কারক জামাতে আহমদীয়া ইন্‌শাআল্লাহ্ এ অপবাদ থেকে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত। কারণ কেবল এ জামাতই বিশ্ব-বুকে দাঁড়িয়ে একথা দৃঢ়চিত্তে বলতে পারে যে, হ্যাঁ এর একজন নেতা আছেন, আর এ নেতা যে নেতা নন, এ নেতা জাগতিক কোন নির্বাচনের রায়ে নির্বাচিত নেতা নন, তিনি সর্বৈর্ব আকাশ কর্তৃক রায়ে নির্বাচিত নেতা। যার সাথে স্বয়ং খোদা কথা বলেন এবং যিনি খোদার সাথে কথা বলেন। তিনি কোনভাবে কোন অবস্থাতেই জাগতিক কোন প্রতিকুলতাকে ভয় করেন না এবং তোয়াক্কা করেন না বরং যে তাঁর প্রতিপক্ষ হয়ে লড়বে সে নির্ঘাৎ ধ্বংস হবে। খোদার অভিপ্রায় এটাই। আর এ শক্তিবলেই সেদিন নীরব নিভৃত অজ এক পাড়াগাঁ কাদিয়ান থেকে শুধু মাত্র চল্লিশজন পবিত্রমনা অনুসারীকে সাথে করে তিনি যে কাজটি শুরু করেছিলেন আজ এর সংখ্যা প্রায় বিশ কোটিতে এসে দাঁড়িয়েছে। ইনশাআল্লাহ্ আর হয়ত বেশি সময়ের প্রয়োজন নেই যেদিন এর সংখ্যা চল্লিশ কোটি কিংবা একশ' কোটিতে এসে দাঁড়াবে। এ জামাতের শ্রান্তিহীন কর্মপ্রচেষ্টার ফলশ্রুতিতে জগৎ আজ বুঝতে পেরেছে যে, কেবল ইসলামই পারে অন্যসব মানুষকে শান্তির আশ্রয় দিতে। কেবল কুরআনই পারে পৃথিবী ব্যাপী অশান্তির এ দাবদাহ থেকে মানুষকে মুক্তি দিতে।

হে বন্ধুবর! আপনার সমীপে আমার সর্বশেষ আকুতি এই যে, আপনি আপনার মেধা, বুদ্ধি ও জ্ঞান দ্বারা বিদ্যা, যুক্তি ও অনুভূতির দ্বারা আপনার কর্ণ দ্বারা, হস্ত, নাসিকা কিংবা চক্ষু দ্বারা, বিজ্ঞান এবং হাদীস কুরআনের দলিল দ্বারা, বিগত দিনে আগত পুণ্যাত্মাগণের দেয় সত্যশর্ত দ্বারা অথবা আত্মার নির্মলতা কিংবা দোয়ার ক্রন্দন দ্বারা, সবশেষে পরিবেশ পরিস্থিতির নির্দেশনার দ্বারা এ স্বর্গপ্রদত্ত পবিত্র পয়গামকে পরখ করে নিন। এটা নিশ্চিত যে, আপনার খোদা আপনাকে এ ব্যাপারে এন্তার সাহায্য করবেন। এত কথা এতভাবে এতবার বলার পরও আপনি যদি আপনার এ দায়িত্ব পালনে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করেন তবে জানবেন, তা আপনার জন্য মোটেই শুভ হবে না। এর জন্য আপনাকে তদ্রূপ কাঁদতে হবে। যেভাবে কোন স্নেহময়ী মা তার সন্তানকে হারিয়ে কাঁদেন। কারণ হযরত মসীহে মাওউদ (আঃ) বলেছেন, "হে জগদ্বাসী! আমি খোদার পূর্ণাঙ্গীন শক্তি ও মাহাত্ম্য দ্বারা তোমাদের মৃত হৃদয়গুলোকে জীবিত করতে এসেছি। তৌহীদের বিষয়টিকে পুনর্জীবিত করতে ও ধর্মের ভীতকে সুদৃঢ় করতে এসেছি। নিশ্চয় আমি আল্লাহ্‌তাআলার সেই নিদর্শন যা সৃষ্টির উপর কৃপার জন্য সময়মত প্রকাশিত হয়েছে। সুতরাং অনুতাপ তাদের জন্য যারা স্বর্গপ্রদত্ত এ নেয়ামতকে প্রত্যাখ্যান করে।"

হে আমার দয়াময় খোদা। তোমার স্বহস্তে নির্বাচিত তোমার খলীফা, আমাদের প্রিয় নেতা হযরত মির্যা মাস্‌রূর আহমদ (আইঃ)-কে তুমি তোমার সকল শক্তি দিয়ে সাহায্য কর। তুমি তাঁর হাতকে তোমার হাতে পরিণত কর। তাঁর কণ্ঠে কঠিন শক্তি দান কর। তাঁর জ্ঞান ও প্রজ্ঞাকে শ্রেষ্ঠত্বের আসনে আসীন কর। তাঁর নাম ও সুনামকে আলোকসম গতিময় করে পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে পৌছে দাও। তুমি তাঁর প্রতিপক্ষ শক্তিগুলোকে ভাঙ্গা কাঁচের ন্যায় চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দাও। তাঁর দোয়া ও ইচ্ছা - আকাঙ্ক্ষাগুলোকে তুমি তোমার আদর-স্নেহ দিয়ে কোলে তুলে নাও। তুমি তাঁর মহিমাময় কর্মগুলোর দ্বারা জগদ্বাসীকে বুঝিয়ে দাও যে, হ্যাঁ, ইসলামই মানুষের একমাত্র ধর্ম আর ইসলামই মানুষের সর্বশেষ গন্তব্যস্থল।

- মোঃ ফজলে-ই-ইলাহী

আমার জীবন, আমার সংগ্রাম
(আমার আহমদীয়ত গ্রহণের প্রেক্ষাপট)

(প্রথম কিস্তি)

আহমদীয়ত গ্রহণ আমার জীবনের সবচাইতে বড় ঘটনা। স্বাভাবিক নিয়মে নয় বরং এর পশ্চাতে সুদীর্ঘকালব্যাপী একটি খোদায়ী পরিকল্পনা আছে বলে আমার মনে হয়। আহমদীয়ত গ্রহণ আমার জীবনে একটি অস্বাভাবিক ঘটনা। হয়তো আল্লাহ্‌র এমন কোন নেক বান্দার রক্তের ফোঁটা আমার মাঝে আছে যিনি ইমাম মাহ্‌দীকে দেখার জন্যে কেঁদেছিলেন আর আল্লাহ্ তা কবুল করেছিলেন; অথচ ইমাম মাহ্‌দী তখনও আসেন নি, এবং আমার মাধ্যমে সেই নেক বান্দার দোয়ার কবুলিয়তের বাস্তবায়ন ঘটালেন। আল্লাহ্‌র সেসব সূক্ষ্ম তত্ত্বাবলী প্রসঙ্গক্রমে প্রায়ই বন্ধুদের নিকট বলতে থাকি। বর্ণনার সময় আমি লক্ষ্য করেছি, তাদের চোখে মুখে তখন এক গভীর কৌতুহল ও ভীতিপূর্ণ অবস্থার সৃষ্টি হত। তারা আমাকে বারবার অনুরোধ করে বলেছেন, এসব ঈমানবর্ধক বিরল ঘটনাসমূহ লিখে কেন আমি পত্রিকায় প্রকাশ করি না। বন্ধুদের অনুরোধ ও "এবং তোমার উপর তোমার প্রতিপালকের যেসকল নেয়ামত আছে তা প্রকাশ করতে থাক"–আয়াত খানির প্রতি লক্ষ্য করে নিজেকে প্রকাশ করলাম। অন্যথায় এসব বিষয় গোপন রাখাটাই অধিক পসন্দ করতাম। আমার বিশ্বাস চিন্তাশীল পাঠকদের জন্যে এতে বিপুল খোরাক আছে। দুর্লভ কিছু তথ্যের জন্যে আশা করি লেখাটি সময়ে ঐতিহাসিক মর্যাদা লাভ করবে।

আমি যখন খুব ছোট ছিলাম তখন থেকেই ধর্মের প্রতি আমার গভীর শ্রদ্ধা ছিল। আলেম উলামার সেবা ও সম্মান করাকে সৌভাগ্যের বিষয় বলে মনে করতাম। আমাদের পরিবারে ধর্মীয় অনুশীলন কঠিনভাবে পালন করা হয়। সুতরাং পারিবারিক সূত্র ধরে সুন্দর একটি অনুভূতি আমি লাভ করেছিলাম। কিন্তু হঠাৎ একটি ঘটনা আমার বিশ্বাসের স্বচ্ছলতায় একটু ঘোলাটে অবস্থার সৃষ্টি করে দিল। আমার বয়স তখন আট কি নয়। আমাদের বাড়ীর প্রায় ৭০ হাত দূরে ঘটনাটি ঘটল। 'ওয়ালাদ্ দোয়াল্লীন' পড়তে হবে না 'ওয়ালায্ যোয়াল্লীন' পড়তে হবে এবং দাঁড়িয়ে কিয়াম করতে হবে না বসে রসূল (সঃ)-এর উপর দুরূদ পাঠ করতে হবে এ বিষয়ের উপর সুন্নী ও ওয়াহাবী মাওলানাদের মাঝে তুমুল যুদ্ধ বাঁধে। বহস্ মারামারী, খুনাখুনীর পর্যায়ে উপনীত হ'ল। মামলা মুকদ্দমা, মিছিল মিটিং হ'ল। হঠাৎ শুনি গ্রামের দক্ষিণ প্রান্তে একই বিষয়-বস্তুর উপর পৃথক একটি ঘটনায় দু'জন খুন হয়েছে। আমাদের পক্ষের ১৮ জন বিশিষ্ট আলেম জেল হাজতে আটকা পড়েন। একদিকে আমরা হরতাল, মিছিল মিটিং, ডি, সি অফিস ঘেরাও ইত্যাদি কর্মসূচী পালন করছি। অপর দিকে আলেমগণ প্রতিপক্ষের আলেমদের নিকট কোর্টে এ মর্মে লিখিত দেন যে, এখন থেকে তাদের ধর্ম তারা পালন করবে, আমরা আর বাদ-বিবাদে লিপ্ত হব না। বন্ড সই করে জেল থেকে তারা মুক্তি নিলেন।

অনেকেই বিষয়টাকে স্বাভাবিকভাবে মেনে নিল কিন্তু আমার ভিতরে আগুন জ্বলে উঠল, আলেমগণ কেন এরকম অপরিণামদর্শী সিদ্ধান্ত নিবেন? তাদেরকে মুক্ত করতে আমরা হরতাল ধর্মঘটে পুলিশের লাঠিচার্জের শিকার আর তারা হুট করে বন্ড সই করে বেরিয়ে এলেন! "ইসলামকে বিদাতমুক্ত রাখতে প্রয়োজনে আমরা ফাঁসীর কাষ্টে যাব" ইত্যাদি উস্কানীমূলক বক্তব্য দিয়ে সরলপ্রাণ মানুষের মাঝে দ্বন্দ্ব ও লাঠালাটি বাঁধিয়ে পরিণামে তারা কাপুরুষের মত কারাগার থেকে বেরোলেন। যে মহাসত্যের জন্যে তারা এক মাসও কারা বরণ করতে পারলেন না, সেরকম হালকা সত্যের জন্যে সাধারণ মানুষ কেন প্রাণ দেবে? এ প্রশ্ন আমার কঁচি মনে দারুণভাবে নাড়া দিল।

আমার প্রপিতামহ (দাদার পিতা) মরহুম আব্দুর রহমান সাহেবের কথা প্রায়ই আব্বার মুখে শুনতাম। কলকাতা আলীয়া মাদ্রাসা থেকে উচ্চ শিক্ষা লাভ করে দেশে ফিরে এসে খিলাফত আন্দোলনের অন্যতম নেতা হিসেবে সমাদৃত হন। সারা জীবন ধর্মের সেবা করেছেন কিন্তু শীষ্যদের কোন পয়সা তিনি গ্রহণ করতেন না। পেশা-ভিত্তিক সকল প্রকার ধর্ম সেবাকে তিনি হারাম বলতেন। সরকারী চাকুরীকে তিনি তাকওয়া বিরোধী ভাবতেন। বাড়ীতে বসে কাপড় কাচার সাবান তৈরী করে নিজেই বাজারে বসে বিক্রি করতেন। এ জীবিকাকে তিনি অধিক হালাল ও তাকওয়াভিত্তিক মনে করতেন। পীর পুরোহিত বা আল্লামা সাজার চেষ্টা তিনি করেন নি। আমার প্রশ্ন জাগল, তাহলে সেই সমস্ত লাঠিয়াল আলেমগণ সেই দৃষ্টান্ত কেন অনুসরণ করেন না? আপন মুখের কথা কেন ভঙ্গ করেন? সাধারণ মানুষকে ঝুঁকিতে ঠেলে দিয়ে নিজেরা কেন এভাবে 'সেইফ' হয়ে যান? ইত্যাদি প্রশ্ন আমার বুকে জ্বলতে থাকে। কিন্তু তখনও আলেমদের প্রতি আমার গভীর শ্রদ্ধা ছিল।

১৯৮৪ সাল। আমার বয়স তখন ১১ বছর। হবিগঞ্জ জেলার অন্যতম মাদ্রাসা বাহুবল কাসিমুল উলুমে সপ্তম শ্রেণীতে ভর্তি হই। উল্লেখ্য, রমযানের বিশেষ কোর্সে ৬ষ্ঠ শ্রেণীর কিতাবাদি আমার ভগ্নীপতির নিকট পড়ে ফেলেছিলাম। তিনি বাংলাদেশের কয়েকজন শায়খুল হাদীসের মাঝে অন্যতম একজন শায়খুল হাদীস। বাংলাদেশ দীনি শিক্ষা বোর্ডের সিলেবাস অনুযায়ী সে মাদ্রাসায় উর্দূ, ফার্সী, আরবী, সরফ, নাহু, মানতিক ইত্যাদি বিষয় পড়ানো হয়। নিম্ন মাধ্যমিক পর্যায়ের সিলেবাসে তখন অংক, ইংরেজী ও বাংলা একেবারেই ছিল না। প্রাথমিক পর্যায়ে ছিল কিন্তু বাস্তবে তা গুরুত্ব সহকারে পড়ানো হ'ত না। দিনকাল তখন ভালই কাটছিল, কিন্তু সমস্যা বাঁধল তখন, যখন চিঠি লিখতে বসে চিঠি লিখতে পারি না। এছাড়া বই - পুস্তকের ভাষা জানতাম না, তাই আঞ্চলিক ভাষায় কথা বলতাম। মানুষ অনেক কথাই বুঝত না, মুখের দিকে তাকিয়ে থাকত। মনের ভাব বুঝাতে কষ্ট হ'ত। একদিন কয়েকজন ছাত্র নিয়ে প্রিন্সিপাল সাহেবের

অফিসে গিয়ে সবিনয়ে আরয করলাম ঃ শিক্ষা বোর্ডের আগামী মিটিং এ আমরা আপনার মাধ্যমে একটি প্রস্তাব উত্থাপন করতে চাই। উর্দূ ফার্সীর স্থানে বাংলা ইংরেজী এবং মানতিক (তর্কশাস্ত্র)-এর স্থানে যেন অংককে সিলেবাসভুক্ত করা হয়। প্রিন্সিপাল সাহেব চটে গেলেন। বল্লেন ঃ শতাধিক আলেম বসে সেখানে সিলেবাস প্রণয়ন করেন এবং হাজার হাজার আলেম তা নির্বাক্যে মেনে নেন, সেখানে তোমাকে প্রশ্ন উঠানোর দুঃসাহস কে দিল? বল কে তোমাকে এ ধরনের ধৃষ্টতাপূর্ণ রদবদলের প্রস্তাব শিখিয়েছেন? দুনিয়া কামাই করতে মাদ্রাসায় এসেছ? শার্ট পেন্ট পরা ইংরেজী শেখা বাবু হওয়ার স্থান এটা নয়। যাও স্কুলে যেয়ে ভর্তি হও! আমি স্তব্ধ হলাম। কিন্তু যে সত্য অন্তর থেকে উৎসারিত হয়, একে ধমক ও ভীতি প্রদর্শন দ্বারা কি দমিয়ে রাখা সম্ভব? বরং সময়ে তা দ্বিগুণ চতুর্গুণ শক্তি নিয়ে বাষ্পের মত বিস্ফোরিত হয়।

একদিন শুনি হবিগঞ্জ বৃন্দাবন কলেজের পার্শ্বে ঈমান ইসলাম নষ্ট করার জন্যে সরকার আনন্দ মেলার পার্মিশন দিয়েছে। এতে জুয়া ও সার্কাস প্রদর্শনী হয়। এ শরীয়ত বিরোধী প্রতিবাদ সভায় আলেমগণ তুখোড় বক্তব্য রাখেন। যারা আনন্দ মেলা ভাঙ্গতে যেয়ে মেশিন গানের গুলীতে জীবন দিবেন, তাদের জন্যে কিয়ামতের দিন নবীজী শাফায়াত করবেন ইত্যাদি বক্তৃতা শুনে আমরা ১৫/১৬ জন প্রস্তুত হলাম, পালাক্রমে মেশিন গানের সামনে গিয়ে দাঁড়াতে। ভাগ্য ভাল, সরকারের অনমনীয় মনোভাব দেখে নেতৃবৃন্দ সেদিন জিহাদের ঘোষণা দেন নি। কৌশল পরিবর্তন করে অবস্থান ধর্ম ঘটের আহ্বান জানান। অবস্থান ধর্মঘট হয়, দাবী আদায়ের পূর্ব পর্যন্ত জন সাধারণের ঐক্যবদ্ধভাবে মহা সড়কের উপর বসে থাকা, যাতে যান বাহনের স্বাভাবিক চলাচল ব্যাহত হয়। সেদিন জিহাদের ঘোষণা দেয়া হয় নি, তথাপি উম্মত জনতা স্থানে স্থানে খন্ড যুদ্ধ করে। বহু হতাহত হ'ল। সেই ঐতিহাসিক সিরিশতলার মাঠ হতে ফিরে এসে দেখি, যার বক্তৃতায় আমরা আত্ম উৎসর্গের জন্যে প্রস্তুত হয়েছিলাম, তিনি বাড়ীতে, নিজে যুদ্ধে যান নি। মাওলানার কান্ডে আমরা দুঃখ পেলাম।

আমার এ চাপা ক্ষোভ ধীরে ধীরে বিদ্রোহে পরিণত হতে চল্ল। আলেম সমাজের কর্ম-কান্ড ও মাসলা-মাসায়েলের অসংলগ্নতা বিষয়ে ক্লাসে প্রশ্ন করি আর ওরা আমাকে শাসন করে ধমক দেয়, আমি নাকি শুধু অপ্রয়োজনীয় বিষয়ের পিছনে লেগে থাকি। ৪ মাযহাব, আলেমদের দলদলি, অকেজো শিক্ষা ব্যবস্থা, তালাক প্রদানের ভুল পদ্ধতি, ভিন্ন মতাবলম্বীদের প্রতি আলেমগণের ডাহা মিথ্যা আরোপ, দাওয়াত, খতম, মিলাদ, পেশাভিত্তিক ইসলামের সেবা ইত্যাদি বিষয়ে প্রশ্ন করতাম। জবাব এসেছে, বেশি বুঝার চেষ্টা করে বহু পন্ডিত আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব অস্বীকার করেছেন। কম বুঝার চেষ্টা কর। নিজেকে বড়ই অসহায় বোধ হ'ত। জীবনটা নিঃসঙ্গ ও নিছক অর্থহীন মনে হতে লাগল। প্রায়ই কেঁদে বলতাম, খোদা, আমাকে সত্য ইসলাম দেখাও!

অবশেষে একটি স্বপ্ন জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দিল। দেখি হযরত মুহাম্মদ (সঃ) একটি কালো দস্তর খান হতে রুটি তুলে ডালে ভিজিয়ে ভিজিয়ে খাচ্ছেন। আবূ বকর, উমর উসমান (রাঃ)ও খাচ্ছেন। রসূল (সঃ) আমাকে 'বসো'! বলে, আনাস (রাঃ)-কে বল্লেন, ওকে খানা দাও! রসূল (সঃ)-এর বাঁ দিকে বসে খেতে খেতে বল্লাম, ইয়া রসূলাল্লাহ্! কোন্ যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত হচ্ছেন? তাঁকে নিরুত্তর দেখে বল্লাম, বদরের যুদ্ধে? বল্লেন, না। বল্লাম, তাহলে কি উহুদের যুদ্ধে? বল্লেন, না সেসব যুদ্ধ আর এখন করতে হবে না। এখন অন্য রকম যুদ্ধ। অনুমতি প্রার্থনা ছাড়াই আমি ফিরে আসার জন্যে দরজার বাইরে চলে এলাম। পিছন থেকে রসূল (সঃ) স্তম্ভিত হয়ে বল্লেন, ওকি! বশীর, তুমি চলে যাচ্ছ? বল্লাম ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ্, অনুমতি চেয়ে আপনাকে 'ডিসটার্ব' করতে চাই নি। বল্লেন ঃ না না, ঐ দেখ, আয়শা (রাঃ) তোমার জন্যে কি নিয়ে আসছে। পালংকের উপর আমি রসূল (সঃ)-এর পাশে বসলাম। আয়েশা (রাঃ) আমার সামনে দাঁড়িয়ে তাঁর হাতের কাগজটি পড়লেন ঃ বদরের যুদ্ধে আল্লাহ্‌র ওপর পূর্ণ আস্থা থাকায় স্বল্প সংখ্যক সাহাবায়ে কেরাম বিপুল সংখ্যক শত্রুর মোকাবেলায় জয়ী হয়েছিলেন। আল্লাহ্‌র নিকট ঈমান ও আমল গ্রহণীয় তাঁর নিকট সংখ্যাধিক্যের মূল্য নেই। অতঃপর বল্লাম, ইয়া রসূলাল্লাহ্, এখন যাই? বল্লেন হ্যাঁ, যাও, কথাগুলো শুনানোর জন্যেই তোমাকে ডেকেছিলাম। দিনটি ছিল মঙ্গলবার। পরের মঙ্গলবারে আবারও রসূল (সঃ)-কে স্বপ্নে দেখি।

আরেকদিন স্বপ্নে দেখি এক ঐশী-মানব আকাশ হতে সোজা আমার পাশে নেমে দাঁড়ালেন। বল্লেন, আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে আমি আপনার নিকট এ ডায়েরী নিয়ে এলাম। লাল সালু কাপড়ে আবৃত ডায়েরী দেখিয়ে বল্লেন ঃ এতে আল্লাহ্ আপনার নাম ওলীদের কাতারে লিখেছেন, তবে আপনাকে আমল আখলাকে ও ঈমানে আরও উন্নত হতে হবে। এ বলে আবার তিনি আকাশে উঠে গেলেন।

এ সমস্ত স্বপ্ন আমি সে এলাকার এক বুযুর্গকে শুনিয়েছিলাম। তিনি বলেছিলেন ঃ সব কথা তুমি এখন বুঝবে না। তোমাকে আল্লাহ্ জীবনে অনেক বড় করবেন। সুতরাং তোমাকে কুরআন হাদীস প্রচলিত পদ্ধতিতে নয়, বরং তাহকীক (গবেষণা) সহকারে নিজের মত করে অধ্যয়ন করতে হবে। আরেকটি স্বপ্নের ব্যাখ্যায় বলেছিলেন ঃ তোমার দ্বারা আল্লাহ্ বাংলা ভাষায় একটি উঁচু মানের কিতাব রচনা করাবেন। তোমার লেখায় চুম্বকের আকর্ষণ থাকবে। আমার বয়স তখন ছিল ১৩ বছর। বাংলায় তখনও চিঠি লিখতে পারতাম না।

আমার জ্বলন্ত বুকে যেন পানির ছিঁটা দেয়া হল। ওদের সাথে আর তর্কে লিপ্ত হতে মন চায় না। মুসলমানদের মাঝে দলগুলোর কোন্‌টি সঠিক, সে বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা করা শুরু করে দিলাম। এ ছাড়া আয়েশা (রাঃ)-এর ইঙ্গিত অনুযায়ী সংখ্যালঘু অথচ ঈমানে আমলে ভরপুর কোন্ দলটি হতে পারে, তা ব্যাকুল চিত্তে খুঁজছিলাম। সুন্নী, রিজভী, ওয়াহাবী, দেওবন্দী, তাবলীগী, মওদূদী কোন দলই আমাকে তুষ্ট করতে পারল না। সিদ্ধান্ত নিলাম ঃ বাংলাদেশ মোল্লা খেদাও আন্দোলন নামক একটি সংগঠন খুলব। কিন্তু এত অর্থ পাব কোথায়? আমার বয়স তখন আঠার। সে দিনগুলোতে আমার বিশ্বাস ছিল (১) এ যুগে একজন নবী আসা দরকার। নবুওয়তের দরজা বন্ধ করে মহা

নবী (সঃ) বিশ্বের জন্যে ক্ষতি করেছেন! (নাউযুবিল্লাহ)। (২) আলেমগণ ইসলামের প্রধান শত্রু। তারা ইহুদীদের চেয়েও নিকৃষ্ট। (৩) ইসলাম মানুষকে একটি অন্ধকার থেকে উদ্ধার করে আরেকটি অন্ধকারে নিক্ষেপ করেছে। (৪) হিন্দু ধর্ম যুলকিফল (আঃ)-এর প্রচারিত ধর্ম। (৫) আলেমগণ বলেন ঃ মানুষের মাঝে সংশোধনের নিমিত্তে (সুলাহ্ বাইনান্ নাস) মিথ্যা বলা জায়েয। সুতরাং কুরআনে বর্ণিত ঈসা (আঃ)-এর সশরীরে আকাশে গমন বিষয়টাও সে রকম একটি মিথ্যা। বৃহত্তর কোন স্বার্থে আল্লাহ্ এটি করেছেন- নাউযুবিল্লাহ্! (৬) মূসা (আঃ)-এর লাঠি দ্বারা আঘাত করে সমুদ্রের পানি দু'ভাগ করার ঘটনাটি সেরকম একটি মিথ্যা। (৭) জ্বীন-ভূত বলতে কিছু নেই। (৮) খিলাফত ব্যবস্থা ছাড়া নামায রোযা, হজ্জ, যাকাত ইত্যাদি অনুষ্ঠান পালন করা অহেতুক ইত্যাদি বহু বিশ্বাস অন্তরে লালন করতাম।

মাদ্রাসার চার দেয়ালের ভিতরে দৈনিকপত্র পত্রিকা ও কোন প্রকার বাংলা পুস্তক পাঠ করা বা সংরক্ষণ করা নিষিদ্ধ ছিল। এতে নাকি মানুষ দুনিয়ামুখী হয়ে যায়। সিলেবাস বহির্ভূত কোন কিছু পাঠ করলে আধুনিকতার ছোঁয়ায় ছাত্রদের আমল আখলাকে নাকি ঘাটতি দেখা দেয়ার আশঙ্কা। তাই বাংলা পড়া নিষিদ্ধ। কিন্তু বাইরের আইন দ্বারা কি মনের কৌতুহল দমিয়ে রাখা সম্ভব? আমি গোপনে দৈনিক ইনকিলাব সাপ্তাহিক খবরের কাগজ ইত্যাদি পাচার করে দরজা জানালা বন্ধ করে অথবা রাতে সবাই ঘুমিয়ে পড়লে রুমের ভিতর বসে পড়তাম। মাঝে মাঝে অনেকেই টের পেতেন। কিন্তু শায়খুল হাদীস সাহেবের শালা হিসেবে আমার বহু অপরাধ ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখা হ'ত। হঠাৎ মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষ 'আল্ হেলাল' নামে একটি পাক্ষিক দেয়ালিকা প্রকাশের সিদ্ধান্ত নিলেন। আমি এর যুগ্ম সম্পাদক। এছাড়া ছাত্র ঐক্য পরিষদ (জমিয়তে তোলাবা)-এর বাহুবল থানা শাখার সম্পাদক সাংগঠনিক আমাকে নিযুক্ত করা হ'ল। উপরোক্ত কারণে আমার উপর থেকে বাংলা পড়ার নিষেধাজ্ঞা সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাহার করা হ'ল। মাদ্রাসায় একটি পাঠাগার স্থাপন করা হ'ল। অন্যান্য ছাত্রদের জন্যে এ পাঠাগারের বই বন্ধের দিনে ও আসরের নামাযের সন্ধ্যার পূর্বে পর্যন্ত সময়ে পড়ার অনুমতি দেয়া হ'ল। আমার প্রতিভা প্রকাশের সকল উপকরণ আল্লাহ্ পাক এভাবেই সৃষ্টি করে দিলেন। মাদ্রাসার ভিতর অপেক্ষা বাইরের লোকজন থেকে বেশি উৎসাহ পেতাম। আল্ হেলালে প্রকাশিত আমার লেখার উপর সর্বপ্রথম পাঠকের দৃষ্টি পড়ত। পক্ষে-বিপক্ষে সমালোচনা হ'ত। আমি কান দিতাম না।

১৯৯৩ সাল। আমি পঞ্চদশ শ্রেণীর (দাওড়ায়ে হাদীস) ছাত্র। লজিং ছিল উত্তর সুর গ্রামের আলী আসগর সাহেবের ঘরে। ব্রাহ্মণবাড়িয়ার (কথিত ফখরে বাঙ্গাল) তাজুল ইসলাম সাহেবও সে ঘরে লজিং থাকতেন। তাঁর সেই খাটেই আমি ঘুমাতাম। তারুয়ার আহমদ আলী সাহেবও সে মাদ্রাসার ছাত্র ছিলেন। সাহিত্য চর্চার উপযুক্ত পরিবেশই পেলাম। দৈনিক, সাপ্তাহিক পত্র-পত্রিকায় লেখা প্রকাশ হতে লাগল। আমার চিৎকার নামক পুস্তিকা প্রকাশিত হওয়ার তিন মাস পর ঘটে গেল একটি প্রলয়ংকরী তান্ডব। পুস্তিকায় আবিষ্কৃত হল এক মহা ভুল। একটি চরণের উপর আপত্তি। মাদ্রাসায় ভাঙ্গচুর হ'ল। মিছিল, মিটিং, ফাঁসী দাবী হ'ল। আমাকে ধরিয়ে দেয়ার জন্যে শরীয়ত বিরোধী কার্যক্রম প্রতিরোধ কমিটি পঞ্চাশ হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষণা করল। সব কিছু আমার বৈরী। বনের গাছপালাও নিরাপদ নয়। সেই দিনগুলোতে বহু ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থা থেকে কুদরতীভাবে আল্লাহ্ আমাকে রক্ষা করেছেন। আমার আব্বা ছাড়া আর কেউ তখন আমার বিশ্বস্ত ছিলেন না। অবশেষে টাঙ্গাইলের কবি আব্দুল হালীম খাঁর বাড়ীতে আশ্রয় পেলাম। শুনলাম, ২৯৫ (ক) ধারায় আমার বিরুদ্ধে ধর্মদ্রোহী মামলা হয়েছে।

বানিয়াচং উলামা পরিষদ তখন আমার আব্বার মাধ্যমে প্রস্তাব পাঠাল ১। বানিয়াচং বড় বাজার থেকে গানিংগঞ্জ বাজার পর্যন্ত গল্লায় রশি বেঁধে আমাকে টেনে হেঁচড়ে নেয়া হবে। অতঃপর হাজার হাজার জনতার সামনে জুতার মালা আমার গলায় পরিয়ে মুসলমান বানানো হবে। পরিবর্তে মামলা প্রত্যাহার করা হবে। অথবা ২। ২৪শে আগষ্ট ১৯৯৩ ইং মধ্যে আমাকে কোর্টে আত্মসমর্পণ করতে হবে। অন্যথায় আমার বাড়ী-ঘর লুট করে জ্বালিয়ে দেয়া হবে। প্রশাসনের বহু কর্মকর্তা প্রতিবাদ সভাগুলোতে আমার বিরুদ্ধে বক্তৃতা দিয়েছেন। এর মাঝে হবিগঞ্জের ডি, সি সাহেব এস পি সাহেব ও দু'জন টি এন ও এর কথা উল্লেখযোগ্য। এতে পরিস্থিতি আরও বেশামাল হয়।

পরিস্থিতির সার্বিক বিবেচনায় ২২শে আগষ্ট আদালতে এসে বিশেষ কারা হেফাযত (সেইফ কাষ্টুডী) প্রার্থনা করি। বিজ্ঞ আদালত তা মঞ্জুর করেন। এরপর চেষ্টা করা হয় আমাকে অগ্নি পরীক্ষায় ফেলার জন্যে। কিন্তু ইব্রাহীম (আঃ)-এর খোদা তো তখনও জীবিত ছিলেন। অলৌকিক উপায়ে আমাকে তিনি রক্ষা করলেন। ও, সি, সাহেব রিমান্ড প্রার্থনা করেন, পর্যাক্রমে এস, পি সাহেবও ডি, সি সাহেব সুপারিশ করলেন কিন্তু ম্যাজিষ্ট্রেট আবেদন না-মঞ্জুর করে দেন। অতঃপর জেলগেইটে আমাকে জিজ্ঞাসাবাদ করার জন্যে সি, আই, ডি টীম প্রেরণ করা হ'ল। গোপন কোন তথ্য আমার নিকট ছিল না, তাই দিতে পারি নি। আচরণ খারাপ্ করার চেষ্টা করল। কিন্তু বিজ্ঞ জেলার সাহেব তাৎক্ষণিকভাবে কড়া ভাষায় তাদেরকে নিবৃত্ত করলেন। বল্লেন, সে আমার সেইফ কাষ্টুডীতে আছে। তারা নিরাশ হয়ে চলে এল। অবশেষে সম্পূর্ণ অযৌক্তিক উপায়ে ডিটেনশন আরোপ করে ডি, সি সাহেব তাঁর দুঃখ নিবালেন।

বিজ্ঞ জেলার ও জেল সুপার সাহেব প্রথম সাক্ষাতেই আমাকে ভালবেসে ফেলেছিলেন। সকলের জন্যে প্রতিদিন ৬০ গ্রাম মাছ / মাংস বরাদ্ধ ছিল। কিন্তু আমার জন্যে প্রতিদিন ১২০ গ্রাম মাছ / মাংসের অর্ডার দিলেন। একজন কয়েদীকে আমার সেবায় যুক্ত করলেন। সম্মানিত বিশেষ আসামীদের জন্যে বরাদ্দকৃত কয়েকটি কক্ষের একটি আমাকে দেয়া হ'ল। গোলাপ, কামিনী, হাসনাহেনা, রক্ত জবা ইত্যাদি ফুলে ফুলে শোভিত ছিল কক্ষের চার পাশ। বাইরে থেকে আমার বিরুদ্ধে আসামীদের প্ররোচনা দেয়া হ'ত। কিন্তু আমার কক্ষের নির্দিষ্ট চতুর সীমার বিশাল এলাকায় সাধারণ আসামীদের পা ফেলা নিষিদ্ধ ছিল। বিশেষ ব্যক্তিবর্গ

জেলার সাহেবের নিকট থেকে অনুমতিক্রমে আমার সাথে সবিনয় দেখা করতেন। আমার দলীল-প্রমাণ ও যুক্তিতে তারা মুগ্ধ হতেন। বলে রাখা ভাল, কারাগার নাম শুনলেই অনেকের সামনেই একটি করুণ বিভৎস ছবি ভেসে উঠে। আসলে তা নয়। সুন্দর, স্বাস্থ্যকর পরিবেশ সেখানে। নির্ধারিত খাবার যা দেয়া হয়, তা অনেকেই খেয়ে শেষ করতে পারে না। গোসল, খাবার, শয়ন, জাগরণ, চলাফেরা, নামায ইত্যাদি সব কিছুই সুন্দর রুটিন মাফিক সম্পাদিত হয়। কোথাও কোন অনিয়ম দেখা দিলে কর্তৃপক্ষকে জবাবদিহি করতে হয়। তাদেরকে শায়েস্তা করার চূড়ান্ত পদক্ষেপ হ'ল- অনশন ধর্মঘট। এতে তাদের টনক নড়ে। এভাবে আমার দশ মাস কেটে গেল। হঠাৎ তল্লাসী চালিয়ে আমার কিছু লেখা বাজেয়াপ্ত করা হল। লেখালেখি করা আমার জন্যে নিষিদ্ধ ছিল। এলাকার পরিস্থিতি যখন শান্ত হ'ল। আমি জামিনে মুক্তি নিলাম।

কাফির ফতোয়ার শুল পায়ে বিঁধেছে। তবুও আমাকে পথিমধ্যে থেমে গেলে চলবে না। দারুল উলুম মাদ্রাসা, মীরপুর-৬, ঢাকা ১২১৬ তে দাওরায়ে হাদীস কমপ্লিট করার জন্যে ভর্তি হলাম। সবকিছু শুনে প্রিন্সিপাল সাহেব আমাকে অভয় দিলেন। মুক্ত মনের অধিকারী তিনি, তাই মুক্ত বুদ্ধির চর্চাকে দূর থেকে তিনি সমর্থন করতেন। বুখারী শরীফের ক্লাসে সূরায়ে মায়েদার তাফসীরে এক পর্যায়ে বল্লেন, দেখেছ বশীর? ইমাম বুখারী কি কৌশলে ঈসা (আঃ)-কে মেরেছেন? সবাই তাঁকে ঘিরে ধরল, কিন্তু এ বলে, তিনি পাশ কাটিয়ে চলে গেলেন যে, এটি ইমাম বুখারীর ইজতেহাদি (চিন্তা প্রসূত) ভুল।

একদিন শুনলাম, বকশী বাজারে আহমদীদের একটি কেন্দ্র আছে। ক্লাসমেট রফিক ভাইকে বল্লাম, চলুন দেখে আসি। বল্ল ঃ তোমাকে ধন্যবাদ! তোমার দুঃসাহসের জন্যে। সাতটি গেইট অতিক্রম করে তাদের মূল অফিসে যেতে হয়। কেউ কোন দিন সেখান থেকে ফেরত আসতে পারে না। হয় কাদিয়ানী হতে হয়, না হয় আন্তর্জাতিক মানব পাচারকারীদের হাতে বিক্রি হতে হয়। এলাকাটি সরকারের নিয়ন্ত্রণমুক্ত। বিনিময়ে সরকার মাসে মাসে বিপুল অংকের টাকা পায়। সবকথা বিশ্বাস হ'ল না, আবার একা একা এসে সেখানে প্রবেশ করার সাহসও করলাম না।

দাওড়ায়ে হাদীস পরীক্ষা দিয়ে গ্রামে ফিরলাম। মাদ্রাসার স্মরণিকায় প্রকাশিত আমার লেখা একটি গল্প নিয়ে আবার হৈ চৈ বাঁধল। গল্পটি ছিল 'আহমদ' নামক একটি ছেলেকে নিয়ে। সে একটি সমাজ বিরোধী চক্রের নির্যাতনের শিকার। একদল উশৃঙ্খল জনতা তার বহু ক্ষতি করেছে। গ্রামের আলেমদের প্রশ্ন হ'ল! আহমদ আসলে কে? আর একদল উশৃংখল জনতা বলতে কাদেরে বুঝানো হয়েছে? পরিস্থিতি দ্রুত পাল্টাচ্ছে। আমি সরে পড়লাম। রাত বারটার সময় দাদার বাড়ীতে গিয়ে আব্বা আমাকে বল্লেন, গ্রাম থেকে বের হওয়ার সকল রাস্তা বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। সম্ভাব্য স্থানগুলোতে তোমাকে তল্লাসী করা শুরু হয়েছে। তাড়াতাড়ি বের হও! দারুণ শীতকাল, কথা কয়টা শুনে দেহে কম্পন সৃষ্টি হ'ল। এত রাতে, এত শীতে, এত কুয়াশা ভেদ করে কোথায় যাব? দাদা একটি সোয়েটার ও একটি কম্বল গায়ে পেঁচিয়ে দিলেন। প্রধান সড়কগুলোতে না উঠে খুঁজে খুঁজে ফাড়ি পথগুলো ধরে গ্রামের দক্ষিণ দিকে পাড়ি দিলাম। এশিয়া মহাদেশের বৃহত্তম গ্রাম আমাদের এই বানিয়াচং। ৪টি ইউ, পি, অফিস এখানে অবস্থিত। অবশেষে গ্রামের দক্ষিণপ্রান্তে অবস্থিত বিরাট একটি বেত কাঁটায় পরিপূর্ণ ঝোঁপ-ঝাড়ের ভিতর দিয়ে খুব সাবধানে আব্বাকে নিয়ে গ্রাম থেকে বেরিয়ে পড়লাম। রাতের আঁধারে কুয়াশা ভেদ করে দশ মাইল পথ অতিক্রম করে আজমিরীগঞ্জ পৌছলাম। ঢাকায় এসে মীরপুর-১ এ অবস্থিত শামসুদ্দীন কাশেমী সাহেবের মাদ্রাসায় রমযান উপলক্ষ্যে আয়োজিত তাফসীর বিষয়ক বিশেষ কোর্সে ভর্তি হলাম। পরে চাকরী হ'ল, ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আমতলী জামে মসজিদে। সেখানে যোগদান করার পর আমতলী নিযামুল উলুম মাদ্রাসায়- ও শিক্ষকতা আরম্ভ করি। কয়েক দিনের ভিতরেই আমার সুনাম চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল। পরে এটি আমার জন্যে এক মযবুত ঘাঁটিতে পরিণত হ'ল। এ যেন সেই মদীনার মাটি!

অতীতের যেকোন সময়ের তুলনায় সেখানকার দিনগুলো আমার ভাল ছিল। মানুষ নিরপেক্ষ মনে আমার কথা ও যুক্তি প্রমাণগুলো বিচার বিশ্লেষণ করত। জুমুআর খুতবায় আমি মুক্ত মনে স্বাধীনভাবে কথা বলতাম। যেসব কথার জন্যে নিজ এলাকায় বেদীন আখ্যা পেয়েছি, সেসব কথার দ্বারা সেখানে নেতৃত্বের মর্যাদা পেয়েছি। কিন্তু সেখানেও বেশ কয়েকবার মুখালিফত হয়েছে। সর্ব প্রথম তাবলীগঅলাদের পক্ষ থেকে। বলেছিলাম, আপনারা হলেন তা'লীমী জামাতের লোক। তাবলীগ জামাত নাম রাখাটা আপনাদের ন্যায়সঙ্গত নয়। যারা জানে না, তাদের নিকট ঈমানের দাওয়াত পৌছানো হ'ল- তবলীগ। আপনারা মুসলমানদের ঘরে ঘরে এমন কি জিনিস নিয়ে যান, যা তারা জানে না? আপনারা তা'লীমী জামাতের লোক। আমার জনসমর্থন থাকায় তারা তেমন সুবিধা করতে পারে নি।

জুমুআর খুৎবায় একদিক বলেছিলাম ঃ খলীফার অনুমতি ছাড়া জুমুআর নামায, হজ্জ পালন, যাকাত প্রদান, মসজিদ মাদ্রাসা নির্মাণ ও পরিচালনা সঠিক নয়, অথচ আলেমগণ ঐক্যবদ্ধ হয়ে একজন খলীফা নির্বাচন করছেন না, সেহেতু আপনারা তাদেরকে বয়কট করুন। তাদের ওয়াজ মাহফিলে যাবেন না। চাঁদা দিবেন না। তাদের পিছনে নামায পড়বেন না। জানাযার নামায নিজেরা শিখে নিন। আলমদের দাওয়াত খাওয়ানোর কথা কুরআন সুন্নায় নেই বরং এতীম, মিসকীন, বিধবা অসহায়কে দাওয়াত খাওয়ানো ও আর্থিক সাহায্য দানের কথা কুরআনে আছে। আমাকেও এখন থেকে দাওয়াত দিবেন না ইত্যাদি। তখন প্রচন্ড বিরোধিতা আসে বাইশটি গ্রামের ইমামদের সমন্বয়ে গঠিত ইমাম সমিতির পক্ষ থেকে। কিন্তু আমার তাতে কিছুই হয় নি আল্লাহ্‌র ফযলে। (চলবে)

- বশীর আহমদ

কবিতা

ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)-এর আগমন

দীন ইসলাম জিন্দাবাদ
আহমদীয়ত জিন্দাবাদ॥
তৌহীদেরই ঝান্ডা লয়ে
এলেন মাহ্‌দী এ ধরাতে।
আল্ কুরআনের শিক্ষা লয়ে
এলেন মাহ্‌দী এ ধরাতে।
মুহাম্মদ (সঃ)-এর বাণী লয়ে
এলেন মাহ্‌দী এ ধরাতে।
মাহ্‌দীর হাতে করলে বয়াত
রইবে না তো এ দেহের পাপ।
বয়াত নিলে মাহ্‌দীর হাতে
মুক্তি পাবে আখেরাতে।
দীন ইসলাম জিন্দাবাদ
আহমদীয়ত জিন্দাবাদ॥
আল্লাহ্‌র নবী (সঃ) গেছেন বলে,
ইমাম মাহ্‌দী (আঃ) যাহির হলে,
আমার সালাম দিবে তাকে
বয়াত নিবে তাহার হাতে।
বলে গেছেন আল্লাহ্‌র নবী (সঃ);
বরফের পাহাড় দিয়ে পাড়ি,
যাবে ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)-এর কাছে
বয়াত নিবে তাহার হাতে।
আল্লাহ্‌র নবী (সঃ) গেছেন বলে,
ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)-কে না মানিলে
জাহিলিয়তের মরণ হবে
পরকালে সাজা পাবে।
এ যুগের ইমাম মাহ্‌দী
গোলাম আহ্‌মদ কাদিয়ানী (সঃ)
নুর নবী (সঃ)-এর পূর্ণ ছবি
তাঁহার মাঝে দেখতে পাবি।
এম. টি. এ-তে অহোরাত্র
বলছে সদা অবিরত।
'হাযা ইমামুল মাহ্‌দী
হাযা ইমামুল মাহ্‌দী'।
মাহদীর হাতে করলে বয়াত
রইবে না তো এ দেহের পাপ।
বয়াত নিলে মাহদীর হাতে
মুক্তি পাবে আখেরাতে।
দীন ইসলাম জিন্দাবাদ
আহমদীয়ত জিন্দাবাদ।

- নাসের আহমদ আনসারী

শুভ বিবাহ

❑ জনাব মোহাম্মদ নাসির আহমদ-এর কন্যা মোসাম্মাৎ সালমা বেগম সাং কান্দিপাড়া, জেলা-ব্রাহ্মণবাড়িয়া-এর বিয়ে মরহুম আব্দুর রশীদ-এর পুত্র জনাব মোহাম্মদ রাশেদ, সাং-কান্দিপাড়া, জেলা- ব্রাহ্মণবাড়িয়া-এর সাথে টাকা ২০,০০১/= (বিশ হাজার এক) টাকা মোহরানা ধার্যে গত ২৮/০৬/০৩ তারিখ, রোজ শনিবার আহমদীয়া মুসলিম জামাত, ব্রাহ্মণবাড়িয়া আহমদীয়া মসজিদে অনুষ্ঠিত হয়, আলহামদুলিল্লাহ্। বিয়ের এলান করেন মৌঃ শামসুল ইসলাম, মোয়াল্লেম।

ন্যাশনাল রিশ্‌তানাতা দপ্তর, বাংলাদেশ কর্তৃক বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নং ০৩৬৩/০৩ তারিখ ১১/০৭/০৩।

❑ জনাব আব্দুল কাদের তালুকদার-এর কন্যা মোসাম্মাৎ নুসরত জাহান রোজিনা সাং টাউন কালিকাপুর, পটুয়াখালী-এর বিয়ে জনাব আব্দুল আজিজ-এর পুত্র জনাব আতাউর রহমান সিরাজ সাং- কান্দিপাড়া, জেলা- ব্রাহ্মণবাড়িয়া-এর সাথে ১,০০,০০০/= (এক লক্ষ) টাকা মোহরানা ধার্যে গত ০৬/০৬/০৩ তারিখ, রোজ শুক্রবার পটুয়াখালীস্থ আব্‌দুল কাদের তালুকদার সাহেবের বাসায় অনুষ্ঠিত হয়, আলহামদুলিল্লাহ্। বিয়ের এলান করেন মৌঃ এস, এম, তৌহিদুল ইসলাম, মোয়াল্লেম।

ন্যাশনাল রিশ্‌তানাতা দপ্তর, বাংলাদেশ কর্তৃক বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নং ০৩৬৪/০৩ তারিখ ১১/০৭/০৩।

❑ জনাব আব্দুল আউয়াল-এর কন্যা মোসাম্মাৎ মাসখুদা খাতুন (পান্না), সাং - মৌড়াইল, জেলা- ব্রাহ্মণবাড়িয়া-এর বিয়ে মোঃ কামরুল ইসলাম ভূইয়া-এর পুত্র জনাব মোহাম্মদ মনোয়ারুল ইসলাম, সাং- ২৯, কাতালগঞ্জ রোড, পাঁচলাইশ, জেলা- চট্টগ্রাম এর সাথে ১,০০,০০১/= (এক লক্ষ এক) টাকা মোহরানা ধার্যে গত ০৫/০৬/০৩ তারিখ, রোজ বৃহস্পতিবার কন্যার পিত্রালয়ে অনুষ্ঠিত হয়, আলহামদুলিল্লাহ্। বিয়ের এলান করেন মৌঃ শামসুল ইসলাম, মোয়াল্লেম।

ন্যাশনাল রিশ্‌তানাতা দপ্তর, বাংলাদেশ কর্তৃক বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নং ০৩৬৫/০৩ তারিখ ২৮/০৭/০৩।

❑ জনাব ডাঃ শরিয়ত উল্লাহ্-এর কন্যা মোসাম্মাৎ রত্না আক্তার লাকী, সাং- দূর্গারামপুর, ডাকঘর- বীরগাঁও, জেলা- ব্রাহ্মণবাড়িয়া-এর বিয়ে জনাব আবু সাঈদ মোল্লা-এর পুত্র জনাব জি, এম, মঈনউদ্দীন নয়ন, সাং- তারুয়া, থানা-আশুগঞ্জ, জেলা- ব্রাহ্মণবাড়িয়া এর সাথে ১,৫০,০০১/= (এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার এক) টাকা মোহরানা ধার্যে গত ১১/০৭/০৩ তারিখ, রোজ শুক্রবার ঢাকাস্থ দারুত তবলীগ মসজিদে অনুষ্ঠিত হয়, আলহামদুলিল্লাহ্। বিয়ের এলান করেন মাওলানা সালেহ আহমদ,মুরব্বী সিলসিলাহ্।

ন্যাশনাল রিশ্‌তানাতা দপ্তর, বাংলাদেশ কর্তৃক বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নং ০৩৬৬/০৩ তারিখ ২৮/০৭/০৩।

❑ জনাব মোহাম্মদ আব্দুস সালাম-এর কন্যা মোসাম্মাৎ সেলিনা খাতুন সাং তেবাড়ীয়া, দক্ষিণ পাড়া, জেলা- নাটোর-এর বিয়ে মোঃ আবদুল করিম প্রাঃ-এর পুত্র জনাব আব্দুর রাজ্জাক সাং-সরের হাট, ডাকঘর- বাঘা, জেলা- রাজশাহী এর সাথে ৬৫,০০০/= (পঁয়ষট্টি হাজার) টাকা মোহরানা ধার্যে গত ১১/০৭/০৩ তারিখ, রোজ শুক্রবার আহমদীয়া মুসলিম জামাত, তেবাড়িয়াস্থ জামে মসজিদে অনুষ্ঠিত হয়, আলহামদুলিল্লাহ্। বিয়ের এলান করেন মৌঃ মুহাম্মদ আমীর হোসেন, মোয়াল্লেম।

ন্যাশনাল রিশ্‌তানাতা দপ্তর, বাংলাদেশ কর্তৃক বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নং ০৩৬৭/০৩ তারিখ ২৮/০৭/০৩।

❑ জনাব মোহাম্মদ সিদ্দিকুর রহমান-এর কন্যা মোসাম্মাৎ আজিজা সুলতানা সাং ২২৬, নন্দাপাড়া, ডাকঘর- আশকোনা, উত্তরা, ঢাকা-এর বিয়ে মরহুম সৈয়দ আবুল হাসান-এর পুত্র জনাব সৈয়দ আজিজুল হাসান সাং- অম্বরনগর, জেলা- নোয়াখালী-এর সাথে ১,০০,০০১/= (এক লক্ষ এক) টাকা মোহরানা ধার্যে গত ১১/০৭/০৩ তারিখ, রোজ শুক্রবার আহমদীয়া মুসলিম জামাত, ঢাকাস্থ দারুত তবলীগ মসজিদে অনুষ্ঠিত হয়, আলহামদুলিল্লাহ্। বিয়ের এলান করেন মাওলানা সালেহ আহমদ, মুরব্বী সিলসিলাহ্।

ন্যাশনাল রিশ্‌তানাতা দপ্তর, বাংলাদেশ কর্তৃক বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নং ০৩৬৮/০৩ তারিখ ২৮/০৭/০৩।

এসব বিয়ে সার্বিকভাবে কল্যাণমন্ডিত হওয়ার জন্য সকলের কাছে দোয়ার অনুরোধ করা যাচ্ছে।

- মোহাম্মাদ আব্দুস সাত্তার
ন্যাশনাল সেক্রেটারী, রিশতানাতা
আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশ

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

সাপ্তাহিক আন্ নূর সাময়িকী ২য় সংখ্যা বিগত ২৫শে জুলাই চট্টগ্রাম থেকে বের হয়েছে। ২৭শে মে, ২০০৩ ইং ইসলামী খিলাফত দিবস উপলক্ষ্যে আন্ নূর বিশেষ সংখ্যা হিসাবে আত্ম প্রকাশ করে। সত্যের মুখোমুখি অহর্নিশ। মূল্যবান প্রবন্ধ ফিচার সম্বলিত গুরুত্বপূর্ণ লেখা ছাপা হয়েছে। আধুনিক মানের তথ্যসমৃদ্ধ বস্তুনিষ্ঠ মননশীল এ পত্রিকাটি সংগ্রহে রাখার মতো।

আহমদীয়ত একটি ধ্রুব সত্য। তাদের জীবন উন্মুক্ত গ্রন্থের ন্যায় বিদ্যমান। আমাদের পরিচয় গোপনীয়তায় আবৃত নয়। মানুষকে জানতে দিতে হবে। প্রকৃত সত্যকে এবং সত্যকে জানাতে হবে নির্বিঘ্নে। মানুষ আহমদীয়তকে চিনুক, জানুক। এখানে লুকোচুরির কিছুই নেই। সত্যকে প্রকাশ করতে আন্নূর পিছপা হবে না এটা আমাদের অঙ্গীকার।

সম্পাদক ও প্রকাশক ঃ **আমীর মাহমুদ ভূঁইয়া**
যোগাযোগ ঃ ৪নং ঘাটফরহাদ বেগ, চট্টগ্রাম

এম,টি,এ-এর নতুন স্টুডিও উদ্বোধন

গত ২২শে জুলাই, ০৩ মোহতারম ন্যাশনাল আমীর সাহেব আহমদীয়া মুসলিম জামাত বাংলাদেশের এম,টি,এ বিভাগের নতুন স্টুডিও উদ্বোধন করেন, আল্হামদুলিল্লাহ্।

উদ্বোধন উপলক্ষ্যে স্টুডিওতে একটি ঘরোয়া অনুষ্ঠান হয়। অনুষ্ঠানের শুরুতে মাওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী সাহেব, ইনচার্জ এম. টি. এ বাংলাদেশ কর্মীদের পরিচয় করিয়ে দেন ও তাদের কর্মকান্ড সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেন। এরপর মোহতারম মোবাশ্বের উর রহমান, ন্যাশনাল আমীর, বাংলাদেশ তাঁর বক্তব্যে এম. টি.এ বাংলা বিভাগের কর্মীদের উদ্দেশ্য করে বলেন, আপনারা যারা এখানে স্বেচ্ছাসেবী হিসাবে কাজ করছেন তাদের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ। আপনারা যদি কেবল মাত্র আল্লাহ্র সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে এ সেবা করে থাকেন তাহলে অবশ্যই আপনারা এর উত্তম প্রতিদান পাবেন। আমি আপনাদের নিকট আহবান জানাবো, আপনারা অবশ্যই নিয়্যত ঠিক করে এ সেবামূলক কাজে মনোনিবেশ করবেন। তাহলে আপনারও কল্যাণমন্ডিত হবেন আর আপনাদের কাজেও বরকত হবে। উক্ত অনুষ্ঠানে এম, টি, এ বাংলা বিভাগের চেয়ারম্যান জনাব মীর মোবাশ্বের আলী, জনাব নূরুল হক, সেক্রেটারী, অডিও ভিডিও ভলান্টিয়ার কর্মীসহ উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানের শেষে মোতহতরম আমীর সাহেব দোয়া করান।

- রিপোর্ট - **আহমদ তারেক মুবাশ্বের**

কৃতী ছাত্র-ছাত্রী

ছামিয়া আক্তার এ বছর মাধ্যমিক পরীক্ষায় বিজ্ঞান গ্রুপ হতে ৬টি বিষয়ে এ প্লাস সহ ৪.৭৫ জিপি এ নাম্বার পেয়ে উত্তীর্ণ হয়েছেন। সে প্রাইমারী ও জুনিয়ার পরীক্ষায় ২য় গ্রেড় এ বৃত্তি লাভ করেছিল। উল্লেখ, সে দুর্গারামপুর (নবীনগর) জামাতের প্রতিষ্ঠাতা প্রেসিডেন্ট মৌলবী আফজল হোসেন এর পুত্র মরহুম ফজলুল করীম সাহেবের নাত্নী এবং জনাব তফাজ্জল হোসেন ও ফিরোজা বেগম-এর কন্যা, আল্হামদুলিল্লাহ্।

একই জামাতের ওয়াক্ফ এ জিন্দেগী মরহুম মোঃ ইয়াকুব আলী সাহেবের নাতি ও জনাব মোঃ জিকরে-ই-এলাহী সাহেবের পুত্র জনাব ইয়ার এলাহী সাহেব উক্ত পরীক্ষায় বিজ্ঞান গ্রুপ হতে ৫টি বিষয়ে এ প্লাস সহ ৪.৫৬ জিপিএ নম্বর পেয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে। উভয়ের সার্বিক মঙ্গলের জন্য সকলের নিকট দোয়ার আবেদন করছি।

- **তফাজ্জল হোসেন**

তা'লীম তরবিয়তী ক্লাস অনুষ্ঠিত

আহমদীয়া মুসলিম জামাত নিউ সোনাতলার উদ্যোগে গত ২৫, ২৬ ও ২৭শে জুলাই তিনদিনব্যাপী এক তা'লীম তরবীয়তী ক্লাস অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত ক্লাস মোট ২৪ জন নও মোবায়েঈন ও জেরে তবলীগ উপস্থিত ছিলেন। সর্বক্ষণ ক্লাস পরিচালনা করেন মোঃ জাহিদুল ইসলাম মোয়াল্লেম। মাঝে মাঝে ক্লাস পরিচালনা করেন সেক্রেটারী মাল আবু সাঈদ মিলন, প্রেসিডেন্ট জয়নাল আবেদীন, যয়ীম মোঃ আক্কেল আলী।

- **মোঃ জয়নাল আবেদীন**, প্রেসিডেন্ট
আহমদীয়া মুসলিস জামাত, নিউ সোনাতলা

বৃক্ষ রোপণ সপ্তাহ-২০০৩

গত ১১ই জুলাই, ২০০৩ইং মজলিসে আনসারুল্লাহ্ সুন্দরবন-এর উদ্যোগে "বৃক্ষ রোপণ সপ্তাহ ২০০৩" এর উদ্বোধন হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতি ছিলেন জেলা নায়েম জনাব শেখ সফর উদ্দিন, প্রধান অতিথি ছিলেন স্থানীয় আমীর জনাব এস এম আবূ কওসার এবং সম্পূর্ণ অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন যয়ীমে আলা জনাব আহমদ আলী মোল্লা। অনুষ্ঠানে ৫২ জন মুসল্লি উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠান শেষে আমীর সাহেব ও জেলা নায়েম সাহেব ২ জনই ২টি ফলজ বৃক্ষ রোপণ করেন। সপ্তাহব্যাপী এ কার্যক্রমে। মহান আল্লাহ্ সকলকে তাঁর প্রাকৃতিক পরিবেশ ধরে রাখার তৌফীক দিন।

- **আব্দুল হাকিম মোল্লা**, মোন্তাযেম উমুমী
মজলিসে আনসারুল্লাহ্, সুন্দরবন

সংশোধনী

❑ পাক্ষিক আহমদীর ১৫ই জুলাই ২০০৩-এর সংখ্যায় 'শতায়ু লাভের সোনালী উপদেশ' শীর্ষক প্রবন্ধে অনবধানবশতঃ নিম্নলিখিত ত্রুটি রয়ে গিয়েছে। পাঠক-পাঠিকাদেরকে সংশোধন করে নেয়ার অনুরোধ জানানো যাচ্ছে ঃ

পৃষ্ঠা নং	কলাম	লাইন	যা ছাপা হয়েছে	যা হওয়া উচিত
৩১	৩	৪	মধু বসে বসে খান	মধু চুষে চুষে খান
৩২	২	৩৬	প্রয়োজনীয় বিশ্রাম দিন	প্রয়োজনীয় বিশ্রাম নিন

❑ পাক্ষিক আহমদীর ৩১শে জুলাই ২০০৩ সংখ্যার 'একনজরে আহমদীয়া জামাতের শত বছরের সাংবাদিকতা' শীর্ষক প্রবন্ধের ৩৫ পৃষ্ঠার ২য় কলামের ১৪ লাইনে ১৮৯৪ সনের পরিবর্তে ১৯৮৪ পাঠ করতে হবে। পাঠক-পাঠিকাদের এ অসুবিধার জন্যে আমরা দুঃখিত।

- **নির্বাহী সম্পাদক**

শোক সংবাদ

অত্যন্ত দুঃখ ভারাক্রান্ত হৃদয়ে জানাচ্ছি যে, ব্রাহ্মণবাড়ীয়ায় দক্ষিণ আহমদী পাড়া নিবাসী মরহুম আবদুল আলীম সাহেবের স্ত্রী মিসেস সামসুন্নাহার বেগম, আমার মা বিগত ২৯/০৭/২০০৩ইং তারিখ সন্ধ্যা ৬.৩৪ মিনিটে ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহে ..... রাজেউন)। মৃত্যুকালে মরহুমার বয়স হয়েছিল প্রায় ৭০ (সত্তর) বছর। মৃত্যুর সময় তিনি ৩ (তিন) ছেলে ও একাধিক নাতি, নাতনী ও অসংখ্য আত্মীয়স্বজন রেখে গেছেন। ব্যক্তি জীবনে তিনি ছিলেন সাহসী, পরপোকারী, সর্বোপরি খোদাভীরু। আল্লাহ্তাআলা যেন তাঁকে জান্নাতুল ফেরদৌসে দাখিল করেন ও তাঁর রূহের মাগফেরাত কামনায় সকলের নিকট দোয়ার আবেদন জানাচ্ছি।

- **মোহাম্মদ গোলাম কাদের**
এডিঃ মোন্তাযেম উমুমী
মজলিসে আনসারুল্লাহ্, ঢাকা

TRUST THE LOGO

CALL CONCORD

CONCORD

CONCORD CONDOMINIUM LTD.

CONCORD CENTRE 43,NORTH GULSHAN C/A, DHAKA-1212

Tel : 8824724, 8812220, 8824076, Email-mhk@bdmail.net Fax : 880-2-8823552

Kh. Imteeaz Uddin Nayeem ITP
Tax Consultant

Golden View Consultancy Services

(A house of Consultants on Accounts, Income Tax, VAT & Company Affairs)

Business Solution :

- Accounting Work
- Taxation
- Company Affairs
- VAT & Custom Duty
- Work Permit.

Address :

Khan Mansion (9th Floor)
107, Motijheel C/A, Dhaka
Phone : 8128812
Mobile : 019344688

স্বাচ্ছন্দ্য ও মনোরম পরিবেশে স্বাদে ভরপুর রুচিকর
খাবার পরিবেশনে অনন্য

ধানসিঁড়ি খাবার

ধানমন্ডি অর্কিড প্লাজা (রাপা প্লাজার পার্শ্বে)
ফোন ঃ ৯১৩৬৭২২

সূচনা রেন্ট-এ-কার

যে কোন স্থানে যে কোন সময়ে ট্রিপের জন্য যোগাযোগ করুন ঃ

সালমান

৬৭৬/৩২ ধানমন্ডি আবাসিক এলাকা, ঢাকা
ফোন ঃ ৯১১৮৭৪৯

পাক্ষিক আহমদীর
অব্যাহত অগ্রযাত্রায়
আমাদের
অভিনন্দন

PRODUCER OF QUALITY NEON SIGN, BELL SIGN, PLASTIC SIGN, HOARDINGS, GIFT ITEMS ETC.

AIR-RAFI & CO.
120/32 Shajahanpur, Dhaka-1217
Phone : 414550, 9331306

New Vo. No. 66 ◆ 3rd Issue August 15, 2003 ◆ Tk. 10.00

Fortnightly **The AHMADI** রেজিঃ নং-ডি, এ-১২

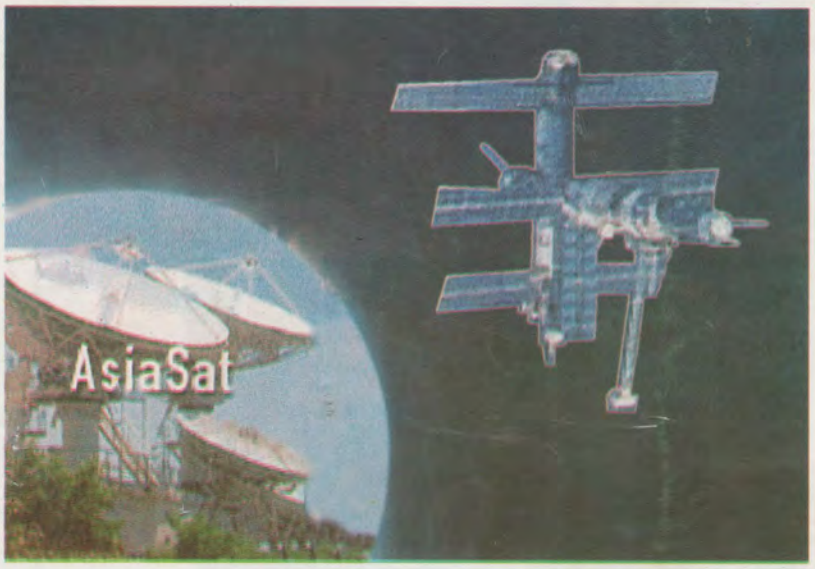

لا إله إلا الله محمد رسول الله

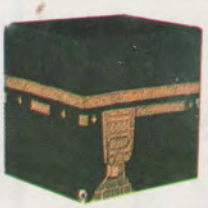

Muslim TV AHMADIYYA International

এমটিএ একটি ঐশী নিয়ামত। আপনার বাড়ীতে এমটিএ-র সংযোগ নিন, নিজের পরিবারকে অবক্ষয় মুক্ত রাখুন।

প্রত্যেক স্থানীয় জামাতের আমীর কিংবা প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব খিলাফতের সাথে নিজের সম্পর্ক আরো মজবুত করার লক্ষ্যে নিজ নিজ জামাতে বেশি বেশি **MTA**-র সংযোগ নিন।

- প্রতি শুক্রবার সন্ধ্যা ৬টায় হুযূর (আইঃ)-এর জুমুআর খুতবা সরাসরি সম্প্রচার
- প্রতিদিন রাত ৮টায় বাংলা সম্প্রচার

ASIASAT 2

এশিয়ার অন্যতম জনপ্রিয় স্যাটেলাইটে **এমটিএ** দেখার সুযোগ গ্রহণ করুন।

DISH POSITION 100.5° EAST

FREQ.	-	3660
S.R	-	27500
POL	-	VERTICAL

বিস্তারিত তথ্যের জন্যে যোগাযোগ করুন ঃ

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ

৪ বক্শী বাজার রোড, ঢাকা-১২১১

Printed and Published by Muhammad F. K. Molla at Ahmadiyya Art Press, 4, Bakshi Bazar Road, Dhaka-1211 on behalf of Ahmadiyya Muslim Jamaat, Bangladesh.
Editor in Charge : Maulana Ahmad Sadeque Mahmood, Executive Editor : Mohammad Mutiur Rahman
Phone : 7300808, 7300849 Fax : 880-2-7300925 E-mail : amgb@bol-online.com